ভোম্বোল সর্দার

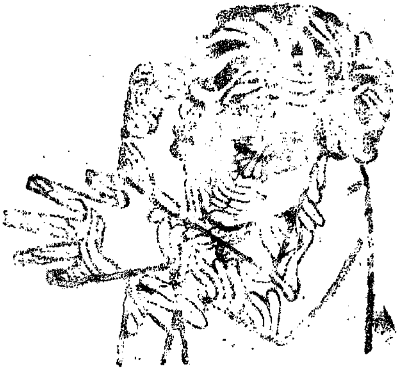

এক

পলাতক

অনেকদিন আগের কথা—

আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন, ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কথাটা যে শোনে সে-ই প্রথমে অবাক হয়, তারপর ভয়ংকর রেগে ওঠে; বলে—ছেলেগুলোর কঠিন শাস্তির দরকার; দেশসুদ্ধু জ্বালালো।'

কর্তারা তাই ছেলেদের বিচারে বসেছেন। বিচার-সভা বসেছে, পাড়ার নিধু চক্রবর্তীমশাইয়ের কাছারি-ঘরের বারান্দায়।

মস্ত খড়ের ঘর; সামনে ফাঁকা উঠোন। তার ও-দিকে বেলতলা, এ-দিকে সজনে গাছ, রাংচিত্রার বেড়ার কোলে কোলে সুপুরি-গাছের সারি। তার মধ্যে একটা গাছ ন্যাড়া। টানা বাতাসে সেও অন্যগুলোর সঙ্গে এক-একবার মাথা দোলাচ্ছে।

চক্রবর্তীমশাই পাড়ার মোড়ল। সকলে তাঁকে সমীহ করে। গোল ভুঁড়িটি বা'র ক'রে একখানা বড় জলচৌকি জুড়ে তিনি বসে আছেন। —হাতে হুঁকো। তাঁর পাশে তক্তাপোষে মাদুরের ওপর পাড়ার ভদ্ররা সকলে বসেছেন। আর, তাঁদের সামনে বারান্দার নিচে, উঠোনে, বাদী ও আসামী দুই-ই হাজির। কেবল আসামীদের সর্দার ভোম্বোল পলাতক।

বাদী হলো বাজারের কাঠগোলার মজুরেরা।

এমনিতেই চক্রবর্তীমশাইয়ের গলার স্বর মোটা। তা আরও মোটা করে ছেলেদের মধ্যে একজনকে তিনি বললেন,—'এই টগ্‌রা, ইদিকে আয়।'

সকলেই জানে টগ্‌রা ভাল ছেলে, দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না ; এক জায়গায় বসে থাকতে ভালোবাসে। সে চক্রবর্তীমশাইয়ের কাছে ভয়ে ভয়ে সরে এলো। চক্রবর্তীমশাইয়ের ঠিক পাশটিতে বসেছিলেন, টগ্‌রার বাবা। তিনি বাঘের মতো রুক্ষ চোখে তার দিকে তাকালেন।

মজুরদের দেখিয়ে চক্রবর্তীমশাই জিগ্যেস করলেন—'ঠিক করে বল্‌, তোরা ওদের একখানা ডিঙি ডুবিয়ে দিয়েছিস্‌ ?'

টগ্‌রা একবার আড়চোখে তার বাবার দিকে তাকালো। তারপর ঢোক গিলে বললে,—'না—হাঁ—মানে ডিঙিখান আপনিই ডুবে গেছে—'

চক্রবর্তীমশাই একটু রসিকতার সুরে জিগ্যেস করলেন,—'ডিঙি কুমীর না কচ্ছপ যে কূল থেকে মাঝ গাঙে সাঁতরে গিয়ে ভুস্‌ করে ডুবে গেল ?'

টগ্‌রার বাবা ধমক দিলেন,—'মিছে কথা বলা হচ্ছে ? ভোম্‌লার সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছ!'

চক্রবর্তীমশাই বললেন,—'আচ্ছা, কথাটা বার করছি।' তারপর বড় বড় চোখ করে ডাকলেন,—'এই ফেকু, ইদিকে আয়।'

ফেকু তাঁর ভাগ্নে। একরত্তি ছেলে সে। তা'র গলার আওয়াজ এক পয়সার মট্‌রা বাঁশির মতো। সেও ভোম্বোলদের দলে ছিল। চক্রবর্তীমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সে পিঁক্‌ করে কেঁদে ফেললো, কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'আর করবো না মামা।'

চক্রবর্তীমশাই বললেন—সে তো পরের কথা। কী হয়েছে বল্‌ দেখি।'

—'কী হয়েছে ? ডিঙি ডুবে গেছে।'

—'কী করে ?'

—'কী করে ? ভুস্‌ করে।'

—'বটে-এ। তার আগে কী হয়েছিল ?'

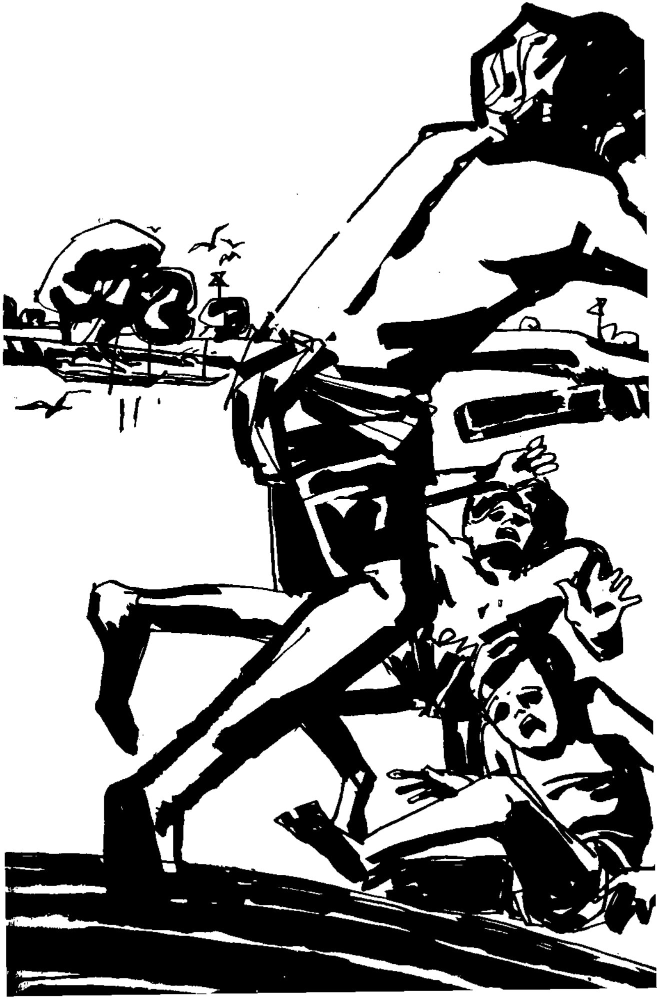

—'তার আগে কী হয়েছিল ?' সে কাপড় চিবুতে চিবুতে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে,—'এই, ভোম্বোলদা—না, ভোম্‌লা—সিদিন আমরা বাজারে বায়স্কোপে রুশ-জাপানের জলযুদ্ধের ছবি দেখে এলে, সকলকে বললে, 'কাল আমরাও ঐ রকম জলযুদ্ধ করবো।' রাখাল বললে, 'জাহাজ পাবে কোথা ?' ভোম্বোলদা বললে, 'জাহাজের আবার ভাবনা ? কাঠগোলার মজুরদের ডিঙি চড়ে যুদ্ধ হবে।' তাই আজ সকালে মজুরদের দু'খানা ডিঙি খুলে নিয়ে তাতে চড়ে মাঝগাঙে গিয়ে আমরা দু'দলে যুদ্ধ করছিলাম। যুদ্ধ করতে করতে—বলেই ফেকু হেসে ফেললো। ছেলের দলও খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো।

তাদের হাসিতে চক্রবর্তীমশাইরা আরও গম্ভীর। দত্তমশাই লাঠি উঁচিয়ে ভাঙা গলায় হুঙ্কার দিলেন—'সব চুপ্! জানো, কত বড় অপকম্ম করেছো ?'

চক্রবর্তীমশাই জিগ্যেস করলেন,—'তারপর ?'

ফেকু বললে,—'তারপর ? ভোম্বোলদা—না, ভোম্‌লা—আমাদের ডিঙি থেকে টগ্‌রাদের ডিঙিতে মানকেকে লগি দিয়ে খোঁচা দিতেই বোদে লগি ধ'রে একটানে ডিঙিসুদ্ধু কাত্ করে দিলে। ডিঙিখানা অমনি উল্টে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল—'

—'সেই ডিঙিতে যারা ছিল, তাদের কী হলো ?'

—'তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিঙির চারধারে সাঁতার কাটতে লাগলো—! কেউ কেউ সাঁতরে মানকেদের ডিঙিতে উঠলাম।'

—'ভোম্‌লা ?'

—'সে উঠলো না। চেঁচিয়ে বললে, 'আমি সেনাপতি। আমার দলের সকলে রক্ষা না পেলে আমি উঠবো না।' সে লালু আর মোংলার সঙ্গে সাঁতরে গিয়ে মালোপাড়ার ঘাটে উঠলো—'

হারান চাকীমশাই বলে উঠলেন—'এঁঃ! ব্যাটা একেবারে জাপানী অ্যাডমিরাল তোগো। উঠবেন না! বর্ষার জল থৈ থৈ ভরা নদী। কুমীর-বেঁশেলে নদীটা এমন বোঝাই—তিনি উঠবেন না! কী ভয়ানক পাজী! আজ আসুক একবার বাড়ি। মেরে—' বলেই তিনি ভোম্বোলের উদ্দেশ্যে হাওয়ায় খুব জোরে এক চড় মারলেন।

ভোম্বোল তাঁর ভাইপো। তার মা-বাবা কেউ নেই।

সেদিন বিচার আর এগোলো না। চক্রবর্তীমশাই মজুরদের বললেন, —'তোরা কাল আসিস্ রে। আসল দোষী যে সে-ই পালিয়েছে। তাকে ধরি আগে।' তারপর ছেলেদের দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন, —যা সব অঙ্ক কষ তো। প্রত্যেকে দেড়শ'টা করে বুদ্ধির অঙ্ক কষবি।'

বেলা তখন চারটে। রেললাইনের ধারে যুগীপাড়ার মাঠে সেদিন তাদের বড় এক ফুটবল ম্যাচ হবার কথা। প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে, থানা-পাড়ার টীম। কসাই-বাড়ি থেকে খাসির চর্বি কিনে বলটাতে বেশ করে মাখানো হয়েছে; ব্লাডারের 'লিক' তিনটেও 'সলিউসান' দিয়ে সারা গেছে—এখন সব মাটি।

ছেলের দল শান্ত সুবোধের মতো যে যার বাড়ি চলে গেল। এক রক্ষা যে, অঙ্কের বইয়ে দেড়শ'টা বুদ্ধির অঙ্ক নেই। তাদের রাগ হলো সর্দারের ওপর। তার জন্যেই সকলের এমন শাস্তি। তিনি বেশ মজা করে সরে পড়েছেন।

কিন্তু দোষ করলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

জায়গাটি ছোট শহর—উত্তরে নদী, দক্ষিণে রেল-লাইন। কিন্তু শহরের মধ্যে গ্রামের মতো এখানে-সেখানে ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন ও বড় বড় গাছ। সন্ধ্যা হলেই এদিক-ওদিক থেকে শিয়ালের পাল হেঁকে ওঠে, ঝিঁঝিঁগুলো ঝাঁ ঝাঁ করে, জোনাকীর ঝাঁক যেন লণ্ঠন দুলিয়ে শূন্যপথে চলে-ফিরে বেড়ায়।

তবে বাজারটা বেশ বড়। সেখানে মাড়োয়াড়ীদের কাপড়ের দোকান ও বড় বড় কাঠগোলা আছে। নদী-পারে গ্রামগুলো থেকে মজুরেরা রোজ ডিঙিতে চড়ে কাঠগোলায় কাজ করতে আসে। তাদের ডিঙিগুলো তখন থাকে ঘাটে বাঁধা। আবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে ডিঙিগুলোতে চড়ে সারি গেয়ে তারা নদীপারে ঘরে ফিরে যায়। তারা গায়—কেঁদে গৌরী কয়, মাগো!

শঙ্খও প-অ-রি-ই-তে ইচ্ছা হয়—'

আর, বৈঠা পড়ে তালে তালে—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্।

দুই

অন্ধকারে

বিচার-সভা ভাঙবার পর প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে। সেদিন ফুটবল ম্যাচ আর হয়নি।

সন্ধ্যাও ঘোর হয়ে এসেছে। গোপীনাথ-বাড়িতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা ঢঙা-ঢঙ বেজে উঠলো। শব্দটা অনেক দূর ভেসে যায়। নদী-পারে গাঁয়ের লোকেরাও সে শব্দ শোনে। আরতির পর বাতাসা দেবার পালা। সেজন্যে পাড়ার ছেলেদের কেউ কেউ পড়া কামাই করে সেখানে আসে। পূজারী-ঠাকুরের সঙ্গে ভাব থাকলে দু-একখানা বাতাসা বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর ভারি চালাক; সকলের সঙ্গে ভাব করে না।

দত্তদের বাড়ির মানকে বাতাসার লোভে পড়া কামাই করে তখন মন্দিরে এলো। সে মন্দিরের দর-দালানে উঠে দেখে, অনেক লোক ব'সে। মন্দিরের ভিতরে একটা মস্ত পিতলের পিলসুজের মাথায় রেড়ীর তেলের একটা বড় প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু বাইরের দর-দালানটায় আবছায়া অন্ধকার। অন্ধকারে সকলকে ঠিক চেনা যায় না। তবে চেনা মানুষকে চিনতে ভুল হয় না।

মানকে দালানের এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলো, ডানদিকের মোটা থামটার পাশে শাদা-মতো একটা যেন কী। জিনিষটা সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো। তবুও বুঝতে পারলো না কী সেটা। সে আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখে, একটা মানুষ কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে। মানুষটাও যেন তাকে দেখেই জড়সড় হয়ে বসলো।

এবার মানকে হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো; বললে;—কী রে ভোম্লা, এখানে পালিয়েছিস্?'

উত্তর হলো,—'চুপ!'

—'কেন? কেউ নেই এখানে। তুই সারাদিন কোথায় ছিলি রে? আমরা কত খুঁজেছি—'

—'নীলকুঠীতে।'

নীলকুঠীটা একেবারে শহরের শেষে নদীর ধারে। অনেক—অনেক কাল আগে সেখানে নীলের কারখানা ছিল। এখন কেবল প্রকাণ্ড একটা ভাঙা পাকাবাড়ি। নীল পচানো মস্ত মস্ত চৌবাচ্চা ও একখানা ভাঙা ইন্‌জিন্ সারা গায়ে মরচে ও ধুলো-মাটি নিয়ে পড়ে আছে।

জায়গাটা খুব নির্জন। তার ওপর গোটা দুই বড় বড় কয়েৎবেল ও একটা ঝাঁক্ড়া অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় মনে হয় সেটা ভূতের রাজ্য। ঠিক দুপুরেও সেখান দিয়ে গেলে গা ছম্ ছম্ করে। লোকে বলে, নীলকুঠীটার বড়কর্তা বুল্ সাহেব নাকি জায়গাটার মায়া ছাড়তে না পেরে রাতের বেলা কবর থেকে উঠে সেই ভাঙা দালানের ফাটা ছাদের আলসেয় লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে বসে খুব মোটা গলায় ইংরেজী গান গায়। আবার, কোন কোন রাতে শাদা প্যাণ্টুলুন্ পরে চৌবাচ্চাগুলোর ধারে ধারে শিয়ালকাঁটা, কালকাশুন্দী ও ভাঁটজঙ্গলে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়!

মানকে বললে,—'তোর ভয় করে নি?'

—'ভয় আবার কী?'

তখন আরতি শেষ করে, শাঁখ বাজিয়ে ঠাকুর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলে। ভেতরে বাতাসা-ভোগ হচ্ছে।

মানকে জিগ্যেস করলো,—'বাড়ি যাবি নে?'

—'না। কিন্তু তোরা আমায় খুঁজেছিলি কেন?'

—নিধু চক্রবর্তীমশাই আর তোর কাকা আমাদের পাঠিয়েছিলেন।'

ভোম্বোল তার কাকাকে খুব ভয় করে। তিনি সা-বাবুদের চরমাদারিপুরের নায়েব। কিছুদিন হলো ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন। কালই আবার চলে যাবেন। পূজোর সময়ে এবার মাদারিপুরে না থাকলে চলবে না। ভোম্বোলকে সেদিন কাঁচা কঞ্চিপেটা করে বার বাড়িতে আমতলায় শুইয়ে ফেলেছিলেন। অনেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে মার

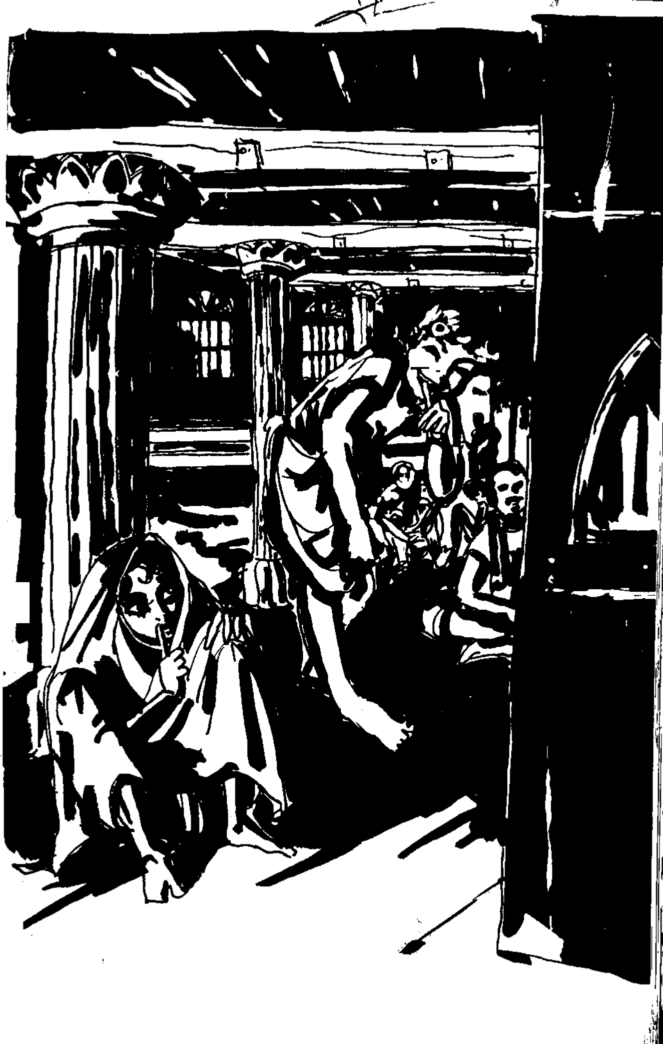

দেখেছিল। ভোম্বোলের গায়ে সে মারের ব্যথা আর নেই; কিন্তু তার লজ্জা আজও সে ভুলতে পারলো না। আবার সেই বাঘের মুখে।

সে বললে,—'মানকে, তুই সরে যা আমার কাছ্ থেকে। এক্ষুনি সকলে টের পাবে আমি এখানে।'

—'কেউ টের পাবে না।'

ভোম্বোল রুক্ষ স্বরে বললে,—'পাবে। সরে যা—'

মানকে ভয়ে ভয়ে সরে গেল। ভোম্বোলের কথার অবাধ্য হ'লে হয়তো এখনি পেটে একটা ঘুসি খেতে হবে।

ভোম্বোল আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে বসলো।

ঠাকুরও মন্দিরের দরজা খুলে ধামা হাতে দালানে বেরিয়ে এলো। ধামায় বাতাসা। ঠাকুর ধামা থেকে বাতাসা তুলে সকলের হাতে হাতে দিতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে সে এলো ভোম্বোলের কাছে। তাকে সেই অবস্থায় দেখে মনে করলো, কোন ভক্ত একমনে গোপীনাথের নাম জপ করছে। একসঙ্গে খান ছয়েক বাতাসা তুলে বললে,—'নিঅ।'

ঠাকুরের বাড়ি ওড়িশার পুরী জেলায়।

ভোম্বোল হাত বাড়িয়ে বাতাসাগুলো নিয়ে আনন্দে নড়ে-চড়ে বসলো। একসঙ্গে এতগুলো বাতাসা সে কোনদিনও পায় নি।

ঠাকুর সেখান থেকে স'রে যেতেই মানকে এসে জিগ্যেস করলো,—'এই, ক'খানা বাতাসা পেলিরে?'

—'এক মুঠো।'

—'কৈ দেখি।'

—'আর দেখে না।'

মানকে চট্ করে সরে গিয়ে বললে,—'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

—'খবরদার! আমার কথা কাউকে বলিস্ নে।'

মানকে একখানা বাতাসা মুখে পুরে বললে—'বলবো?' ব'লেই সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভোম্বোলও আর সেখানে থাকলো না।

গোপীনাথ মন্দিরের উত্তরে খালি দোলমঞ্চ। মন্দিরের দালান থেকে নেমে ফুল-বাগানের পাশ দিয়ে দোলমঞ্চের বেদীর আড়ালে গিয়ে বসে ভোম্বোল নিশ্চিন্ত মনে বাতাসা খেতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। ভক্তরা সকলে বাতাসা নিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেছে। চারধার অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জোনাকী উড়ছে, দত্তদের ডোবা-বোঝাই ব্যাঙগুলো পাল্লা দিয়ে করছে—কঁ্যা—কোঁ—রুটি—রুটি—রুটি—রুটি —।

ভোম্বোল অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখলো, মানকেদের বাড়ির দিক থেকে একটা আলো আসছে। ওদের বাড়ির খান তিনেক বাড়ি পরেই ভোম্বোলদের বাড়ি।

ভোম্বোল আলোটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কাকা কী? ভোম্বোল ভাবলো, মানকেটা নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে ব'লে দিয়েছে। 'ভূত—উল্লুক—ভোঁদড়—।'

ঐ তো আলোটা ক্রমে মন্দিরের দিকেই আসছে। তার কাকার গলাও শোনা গেল। তিনিই ডাক দিলেন,—'ভোম্বো—ও—ও—ল। ভোম্‌লা—আ—আ—'

তাঁরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

ভোম্বোল তাড়াতাড়ি উঠে কোমর বাঁধলো। তারপর মঞ্চটার নিচে নেমে রেল-লাইনের দিকে দিলে চোঁচা দৌড়।

তিন

পথে

সামনেই গোয়ালা-পাড়া।

মাঝে মাঝে ঘি, মাখন আর গোবরের গন্ধে পাড়াটা বেশ মশগুল হয়ে ওঠে। রেল-লাইনটা গোয়ালাদের বাড়ি-ঘরগুলোর ওধারে। ফুলু গোয়ালার বাড়ির কোল দিয়ে গেলে লাইনে পৌঁছনোর পথটা কম হয়।

ভোম্বোল যেতে যেতে দেখলো, ফুলুর বাড়ির বা'র-উঠোনে নট্‌কানা গাছের তলায় ফুলু আর তার ভাই হনি মস্ত একটা হাঁড়িতে ঘোল মইছে—ঘস্ ঘস্। মেটে ঘরখানার বারান্দায় প্রচুর কালো ধোঁয়া ছেড়ে কেরোসিনের একটা চিব্‌নি জ্বলছে। আরে! ঐ যে আলোর কাছে ব'সে ফুলুর ছেলে যদু। সে ভোম্বোলদের ক্লাসে পড়ে। একদিনও পড়া পারে না, কেবল কানমলা খায় আর নীল-ডাউন হয়। 'যোদোটা' যেন কী করছে। সে বেড়ার ধারে সরে গিয়ে, বাঁশের বাতার ফাঁক দিয়ে দেখলো, 'যোদো' একখানা বাঁকের মাথায় দড়ি পরাচ্ছে। তার ইচ্ছে হলো, 'যোদোকে' একবার ডাকে। ও সেদিন তাকে এক ডেলা মাখন খেতে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ওর বাবা আছে। লোকটা ভারী শয়তান! তাকে মাখন তো খেতে দেবেই না, বরং চেপে ধ'রবে। দরকার নেই মাখন খেয়ে।

সে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তার শেষেই গুমটি। গুমটির লম্বা লোহার গেটের ওপর একটা আলো জ্বলছে, টক্‌টকে লাল। গেট বন্ধ। বোধহয় কোন গাড়ি আস্‌ছে। কিন্তু এখন আবার কী গাড়ি আসবে? হয়তো মালগাড়ি। সে গিয়ে গেটের একটা রেলিংয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দু'পাশে তারের বেড়া; মাঝদিয়ে লাইন। লাইনের দু'পাশে কুশ-খড়। তার মধ্যে চামরের মতো কাশফুল ফুটেছে। এখন

সেগুলো দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু দিনের বেলা দেখায় সুন্দর। বাতাসে হেলে-দোলে, ঢেউ খেলে।

ভোম্বোল একবার ভাবলো, লাইনের ওপর দিয়ে স্টেশনে যাবে। স্টেশনটা তো বেশি দূরে নয়। ঐ যে সিগন্যালের আলো দেখা যায়, যেন গোটা কয়েক লাল, সবুজ তারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কিন্তু রাত্রে লাইনের ওপর সাপ শুয়ে থাকে। সেদিন মস্ত একটা গোখরো সাপ গাড়িতে কাটা পড়েছিল।

হঠাৎ সে শুনলো, গেটের কাছে ভাঁট জঙ্গলে শব্দ হচ্ছে, হিস্ হিস্। সাপ নাকি? সে তাড়াতাড়ি গেটের একেবারে মাথায় উঠে রেলিংয়ের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে ব'সে ভাঁট জঙ্গলটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না! তলে শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না; কেবল চারধারে ব্যাঙ ও ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

তবু তার নিচে নামতে সাহস হলো না—যদি সাপটা গেটের তলায় এসে থাকে!

সে সাপটাকে তাড়াবার জন্যে বার কয়েক হাততালি দিলে। শব্দ করলে সাপ পালায়। তারপর কান পেতে শুনতে লাগলো। না—আর শোনা যাচ্ছে না। সাপটা হয়তো সরে গেছে। কিন্তু আবার ঐ ক্যাঁচ-কোঁচ ও ফোঁস-ফোঁসানি শব্দ কিসের?

সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, গেটের ওধারে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো, যেন ভূতের গাড়ি। গরু দুটোর চোখগুলো অস্পষ্ট আলোয় একবার চক্‌চক্ করে উঠ্‌লো। গাড়োয়ান হাঁক দিলে—'গুমটি খুলে দাও গো—ও—ও—'

গুমটি ঘর তখন বন্ধ। গুমটিওয়ালা বোধহয় বাড়িতে ভাত খেতে গেছে। কে তাকে গুমটি খুলে দেবে? লাইন-পারে বাঁশবন। তার তলায় জোলা-পাড়া। গুমটিওয়ালা হলো ছিরু জোলার বাবা চয়নদ্দি। লোকটার ডান হাত কনুই অবধি কাটা। সে ভোম্বোলকে চেনে।

গাড়ি দেখে ভোম্বোলের মনে সাহস হলো। আবার ভয়ও হলো, ছিরুর বাবা তাকে দেখে এখনই হয়তো বাড়িতে খবর দেবে। সে গেট থেকে নেমে লাইন পার হয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়লো।

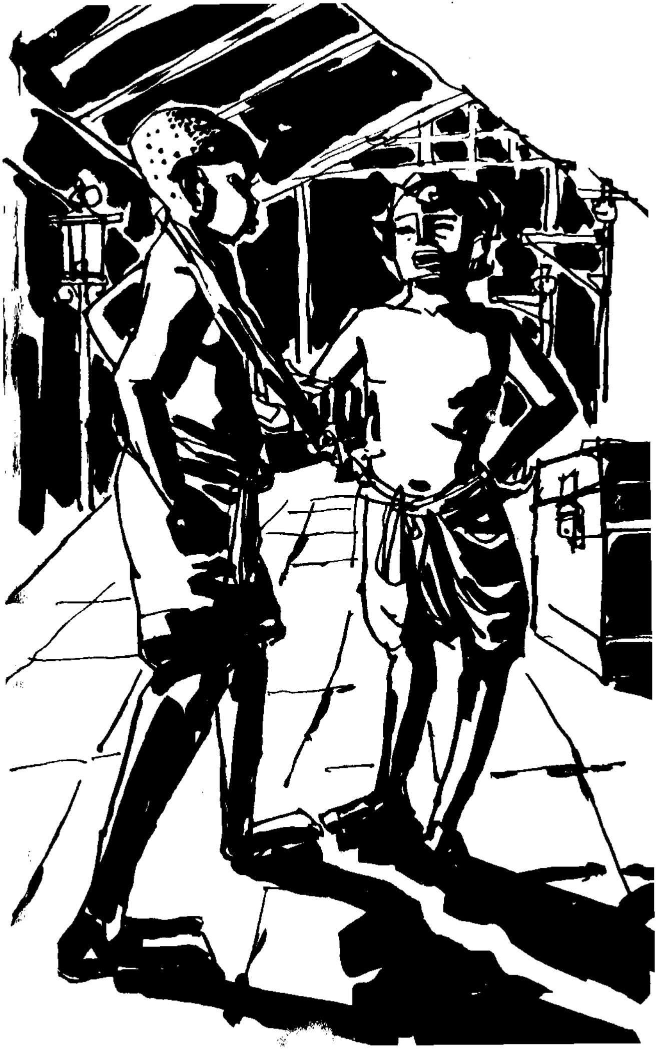

দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই জল রাস্তাটার মাঝে মাঝে জমা হয়ে আছে। ভোম্বোল চলেছে স্টেশনের দিকে। চলতে চলতে তার পা জলকাদায় বসে যায়। একবার একটা শিয়াল তা'র প্রায় গায়ের ওপর দিয়েই ছুটে পালালো। শিয়ালটাকে জোলাদের দুটো কুকুর তাড়া করেছে। শিয়ালটা পালাতেই তা'রা ভোম্বোলকে তেড়ে এলো। কী বিপদ! কিন্তু নেড়ী কুকুরের রোখ শিকারের বিশ হাত তফাৎ অবধি। কুকুর দুটো কেবল ডাকতেই লাগলো। ভোম্বোল সেখান থেকে এগিয়ে পাকা রাস্তায় উঠলো। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে মিট্‌মিটে কেরোসিনের আলো। তবে স্টেশন আর বেশিদূর নয়! ঐ যে তা'র বাইরে রাস্তার একধারে খাবারের দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে—আলো জ্বলছে। লোক চলা-ফেরা করছে।

ভোম্বোল স্টেশনে পেঁাছে প্ল্যাটফরমের এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। তখন কোন গাড়ি নেই। প্ল্যাটফরম প্রায় অন্ধকার। আলো জ্বালাবে গাড়ি আসবার কিছু আগে। দু-একজন যাত্রী কাপড় পেতে পোঁটলা মাথায় দিয়ে এদিক-ওদিক শুয়ে আছে। কেউ কেউ বসে বিড়ি ফুঁকছে, গল্প করছে।

একটা ছোকরা পানওয়ালা ভোম্বোলকে জিগ্যেস করলো,—'তুই কে রে?'

ভোম্বোল চোখ-মুখ রাঙা করে বললে,—'তুই কে রে?'

—'তুই কে আগে বল্।'

—'চুপ্। এক ঘুসিতে দাঁত ভেঙে দেবো —

লড়াইটা বাধে আর কী! ভোম্বোলের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। সে ঘুসি পাকিয়ে দাঁড়ালো।

ছোঁড়াটা বেগতিক দেখে 'ও দাদা, মেরে ফেললো' বলে চীৎকার করতে করতে স্টেশনের বাইরের দিকে দিলে ছুট।

রণক্ষেত্রের কিছুদূরে ডাক রাখ্‌বার কাঠের একটা খুব বড় সিন্দুক ছিল। ভোম্বোল গিয়ে তা'র ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বস্‌লো।

সে আর বাড়ি যাবে না। রাত দুটোয় একখানা গাড়ি আছে। গাড়িখানা যায় কোলকাতায়। সেই গাড়িতে সে কোলকাতায় যাবে। তারপর, সেখান থেকে চলে যাবে টাটানগর। সেখানে তার সঙ্গী জিতেন থাকে।

জিতেন গত বছর স্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে তার বাবার সঙ্গে সেখানে চলে গেছে। তার মুখে সে টাটানগরের কারখানার অনেক গল্প শুনেছে। ভোম্বোল কারখানার কোন একটা কাজে লেগে পড়বে। তার গায়ে খুব জোর ; সে ধমাধম হাতুড়ি পিটবে, লোহা-লক্কড় ঠেলবে—একদিন হয়তো একখানা মোটরগাড়ি, ডুবোজাহাজ বা এরোপ্লেনও তৈরি করে ফেলতে পারে। ইনজিনীয়ার আর কারিগরেরাই তো বিশ্বকর্মা !

তা'র আগে এখন কিছু খাবার পেলে ভাল হোত। খেয়েছে সেই কোন্ সকালে। তাও কাকার ভয়ে পেট ভরেনি। পয়সা থাকলে কয়েকটা চম্‌চম্ খাওয়া যেত। গায়ে শুক্‌নো ক্ষীরের গুঁড়ো মাখানো চমচম্‌গুলো খেতে যা গ্র্যান্‌ড্ !

সে সিন্দুকটার ওপর থেকে নেমে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো। স্টেশনটা ক্রমে নিঝুম হয়ে পড়েছে। রেলের বাবুদের কেউ কেউ অফিসঘরের ছার-পোকাভরা টেবিলগুলোর ওপর বিছানা বিছিয়ে ঘুম দিচ্ছেন। মাঝখানে জ্বলছে, মস্ত চৌকো লণ্ঠন। কোথাও বিশেষ কোন সাড়া নেই। কারুকে চলা-ফেরা করতেও দেখা যাচ্ছে না। কেবল স্টেশনে ঢোকবার মুখে বড় রাস্তার ধার থেকে সেতারের আওয়াজ আস্‌ছে।

ভোম্বোল স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখে, ছাদেক ব্যাপারীর পাটের আড়তের এপাশে অশ্বত্থতলায় ধুনী জ্বলছে। ধুনির ওধারে বসে দু'জন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী, এধারে জন কয়েক লোক—বোধহয় সন্ন্যাসীদের চেলা। ধুনির আগুনের আভায় মনে হচ্ছে, যেন কয়েকটা ভূত বসে।

সন্ন্যাসী দু'জনেরই একজন সেতার বাজাচ্ছে ; তার সঙ্গে তাল দিয়ে চিমটে বাজাচ্ছে অপর জন। সেতারের সুরটা ভোম্বোলের চেনা। সে তার স্কুলের খোট্টা মালির মুখে বার কয়েক এ সুর শুনেছে।

ভোম্বোল রাস্তা পার হয়ে গুটি গুটি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। সুরটা মিঠে ও ভাল, কিন্তু লোকগুলোর চেহারা ভাল নয়। দেখলেই মনে হয়, তা'রা গুণ্ডা। তবে গুণ্ডা হলেই বা তা'র কী ? তা'র কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নেই।

সে তা'দের পাশে দাঁড়াতেই একজন তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালো। মুখে কিছু বললে না। ভোম্বোল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনতে লাগলো। প্রায় আধঘণ্টা পরে সেতার থামলো। ভোম্বোলের মাথায় তবুও সে সুরের ঝঙ্কার থামলো না ; কেবলই বাজতে লাগলো—রিম্-ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা, রিম্-ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা— !

যে সন্ন্যাসীটা চিমটে বাজিয়ে তাল দিচ্ছিল, সে তার পিছন থেকে দুটো পাকা নাসপাতি নিয়ে ভোম্বোলকে বললে,—'এ লে কে ভাগো বেটা !'

লোকগুলোর একজন ধুনি থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা একটা লম্বা কলকের মাথায় তুলতে তুলতে রুক্ষ ভাঙা গলায় বললে,—'ভাগ্‌বে !'

ভোম্বোলও সেখানে আর দাঁড়াতে চায় না।' লোকগুলো যে খুনে বদমাইশ তার্তে আর ভুল নেই। সে সন্ন্যাসীর হাত থেকে নাসপাতি দুটো নিয়ে স্টেশনের ভেতরে চলে গেল।

তারপর সেই সিন্দুকটার মাথায় উঠে বসে গন্ধ শুঁকে দেখলো—চমৎকার! আকারেও বেশ বড়। সে একবার সেতারের সুর নকল করে—'রিম্-ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা' বলেই একটা নাসপাতিতে কামড় দিলে। সেটা খাওয়া হয়ে গেলে বাকিটাও খাবার লোভ হলো। কিন্তু তা'হলে কাল খাবে কী ? তুলেই রাখা যাক্। সে সেটাকে কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে বেঁধে দেখে এলো ক'টা বাজে।

রাত তখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। গাড়ি আসবার দু'ঘণ্টা দেরি। এই দু'ঘণ্টা খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে যদি ঘুমটা গাঢ় হ'য়ে যায়। সেই ফাঁকে গাড়িখানা চলে গেলে কী হ'বে ? কিন্তু ঘুম গাঢ়ই বা হ'বে কেন ? লোকজনের চীৎকারে,

গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রবার ধপ-ধপানি আর ইনজিনের ফোঁস-ফোঁসানিতে কী ঘুম ভাঁঙবে না? নিশ্চয় ভাঁঙবে। সে পড়েছে, নেপোলিয়ঁ ঘোড়ার পিঠে বসে দু-দশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন। লড়াইয়ের মাঝেও তাঁর গাঢ় ঘুম হোত। এ তো বইয়ে পড়া। সে চোখেও দেখেছে, তাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই জগতবাবু ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হাতলহীন পিঠ ভাঙা চেয়ারটায় বসে কেমন নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। আবার 'পিরিয়াড' শেষ হবার ঘণ্টা বাজবার আগেই উঠে পড়েন। তবে সেই বা বেশি ঘুমোবে কেন? সে বাক্সটার ওপর সটান শুয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

কিন্তু মশার উৎপাতে প্রথমটা ঘুম হলো না। মশার ঝাঁক কানের কাছে পিঁ-পিঁ করে, হাতে পায়ে কামড়ায়। একটা তার নাকের ডগায় বসে এমন কামড় দিয়েছে যে, নাকটা জ্বলে যাচ্ছে। সে তাদের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে মরা চিংড়ির মতো হাঁটু ভেঙে কুঁক্‌ড়ে শুয়ে রইলো। তাতেও কী রক্ষা আছে? তবুও সেই ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখে, চারধারে লোকজন ছুটোছুটি ও চীৎকার করছে—সামনে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে। তার ইঞ্জিনখানা করছে—সোঁ—সোঁ—ও—ও!

সে ধড়মড় করে উঠে সিন্দুক থেকে এক লাফে নেমে ছুটে গিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুইসল্‌ দিয়ে গাড়িও দিলে ছেড়ে।

চার

দেশছাড়া

ছোট কামরা—যাত্রীও বেশি নেই। যারা ছিল, তাদের জন কয়েক বেঞ্চি দখল করে শুয়ে আছে। একজন এক কোণে জানলার ধারে ব'সে বিড়ি ফুঁকছে। যারা শুয়েছিল, তাদের একজন জিগ্যেস করলো,—'ছামনে কোন্‌ ইস্টিশেন গো?'

যে লোকটা বিড়ি ফুঁকছিল, সে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—'সাতকোদালে।'

'ও চাচা—চাচা—ওঠো গো'—বলতে বলতে লোকটা উঠে বসলো।

ভোম্বোল এতক্ষণ স্টেশনের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিল। গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে মাঠে এসে পড়লো। অমনি হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এলো। একী! চারধার ফর্সা। রাত দুটোর গাড়িখানা চলে গেছে? সে এত ঘুমিয়েছিল?

এ গাড়িখানা তো কোলকাতায় যায় না, কোলকাতা থেকে আসে। সে তাহলে গোয়ালন্দর দিকে চলেছে? যাঃ! সব গোলমাল হয়ে গেল।

এই গাড়ির শব্দে এক-একদিন তার ঘুম ভেঙে গেছে। সে শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে দেখেছে। চালের আড়ার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। তাদের চাঁপা গাছের ডালে বসে কাক ডাকছে। লেবুতলায় দোয়েল শিষ্‌ উঠ্‌লো; আর, পাশের বাড়িতে নীলমণি উকিলের মুহুরি সুরেন ঢালী কাছারিঘরের ফরাসে শুয়ে শুয়েই হাই তুলতে তুলতে বলছে,—'দুর্গা। দুর্গা।'

ভোম্বোল জানলা থেকে সরে এসে বেঞ্চিতে ব'স্‌লো। একটু শীত শীত করছে। সে কোঁচার কাপড়টা কোমর থেকে খুলে গায়ে

দিলে। খুঁটে বাঁধা নাসপাতিটা তার পিঠের একপাশে রইলো যেন একটা আব।

যে লোকটা এতক্ষণ বিড়ি ফুঁকছিল, সে বার দুই ভোম্বোলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো,—'তুমি কোথা যাবা গো?'

ভোম্বোল বললে,—'টাটানগর।'

লোকটা টাটানগরের নামই শোনেনি; চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলে,—'সে কুন দিক?'

দিকটা ভোম্বোলেরই ভুল হয়ে গেছে! সে বললে!—'ঐদিক।'

—'ত'লি ইদিক যাচ্ছো যে?'

ভোম্বোল উত্তর দিলে না।

লোকটা জিগ্যেস করলে,—'তুমি ইস্কুলির ছাত্তর?'

ভোম্বোল ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে বললে,—'হ্যাঁ—'

লোকটা এবার বেশ ভাল ক'রে ভোম্বোলের পা থেকে মাথা অবধি দেখলো; তারপর বললে,—'বাড়ি থেকে পালিয়ে এয়েছো বুঝি?'

ভোম্বোল চুপ করে রইলো। গাড়ি তখন 'ধর্ না কেন—ধর্না কেন' কর্তে কর্তে বেশ জোরে ছুটছে। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। পূবদিক লাল; রোদ ওঠে ওঠে। সাতকোদালে পিছনে অনেক দূরে পড়ে আছে। সেখানে গাড়ি দাঁড়ায় না। সামনে ট্যাংরামারি। ঐ তার বিল দেখা যায়। বিলের ওপর দিয়ে বক উড়ে যাচ্ছে; গাংচিলেরা ঘুরপাক দিচ্ছে; লম্বা, সরু পা ফেলে পদ্ম পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, ডাহুক। এখন বর্ষার শেষ; এসেছে শরৎ। বিলে জল থৈ থৈ করছে। দেখাচ্ছে, যেন একটা সমুদ্র। বিলটার নাম, মকর। মকর বিল মাছে ভরা। এ সময়টায় জেলেরা দক্ষিণ কোণের খাল দিয়ে মাছ ধরতে আসে। ঐ যে তাদের ডিঙিগুলো দেখা যায়; সার বেঁধে আসছে।

সেবার ভোম্বোলরা সাত-আটজন মিলে ওখানে হেঁটে এসেছিল। সাতকোদালে থেকে মকর বিল তিন-ক্রোশ। রতনপুরের মাঝ দিয়ে

আসা—যাওয়ার পথ। পথের দুধারে বড় বড় ক্ষেত—ধানে ভরা। পাকা ধানগুলোর ওপর যখন হাওয়া বয়ে যায়, শব্দ ওঠে ঝম্ ঝম্, ঝুমুর ঝুমুর, যেন মা-লক্ষ্মী নুপুর পায়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। বিলের কোলে কোলে পদ্ম ও শালুক বন। লতাগুলোর রাঙা ও শাদা ফুলে, মস্ত মস্ত সবুজ পাতায় জল দেখা যায় না। গন্ধে বাতাস ভারি। ফোটা পদ্মবনে মৌমাছি ও সাপের ভয়। তার বন্ধু জগা, পদ্ম তুলতে গিয়ে আর একটু হ'লেই সাপের কামড়ে মরতো। সাপটা পদ্ম-মৃণালের গা জড়িয়ে ফোটা পদ্মটার ওপর মাথা রেখে চু-প করে ছিল। জগা যেই পদ্মটা ছিঁড়বার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, অমনি—'ফোঁ-ও-স্।' সাপটার কত বড় ফণা! ভোম্বোলরা সেবার মাছ ধরেছিল অনেক। কিন্তু বাড়ি ফিরে সে তার খুড়োর মার খেয়েছিল, অনেক বেশি। ভোম্বোলের ইচ্ছে হ'লো, ঐ বিলের পাড়ে ভোরের হাওয়ায় দোদুল কাশবনে গিয়ে ছুটোছুটি করে।

লোকটা ভোম্বোলকে বললে—'শুনছো গো খোকাবাবু, এখনই বাড়ি ফিরে যাও। তোমার কাছে 'টিকিস্' আছে?'

ভোম্বোল জবাব দিলে,—'না।'

—'তবে তো মুশকিল্! তিন ইস্টিশেন পরে 'টিকিস্-সায়েব' আসবে—'

ভোম্বোল দেখেছে, চেকারে টিকিট চেক্ করে। লোকগুলো বেজায় কড়া। সে ঠিক করলো, তার আগেই কোথাও নেমে পড়বে। সেখান থেকে গাঁয়ের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে—সেই টাটানগর।

এমন সময়ে গাড়িখানা ট্যাংরামারী এসে হুস্ করে থামলো। যাত্রীদের কয়েকজন নেমে গেল। এরপর আলমপুর। ভোম্বোল আলমপুরও চেনে।

মিনিট দুই থেমেই গাড়ি একটা হেঁচকা টান দিয়ে আবার চলতে লাগলো। ধানভরা ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে। রাখাল গরু চরাচ্ছে, কৃষাণ ক্ষেতে কাজ করছে। দেখতে দেখতে গাড়ি

আলমপুরও ছাড়িয়ে গেল। কামরাটা এখন একদম খালি। যে লোকটা বিড়ি ফুঁকছিল সেও আলমপুর নেমে গেছে।

খালি কামরায় ভোম্বোলের বড় আনন্দ হলো। সে গাড়ির চাকার শব্দের তালে তালে গান ধ'রে দিলে। গানের মাঝে জানলা দিয়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলো। দেখেই তার বুক কেঁপে উঠলো—পাশের কামরায় চেকার। লোকটা ফিরিঙ্গী, কী, পাঞ্জাবী বোঝা গেল না—কিন্তু চাউনী বড় বিশ্রী। একবার তার দিকেও কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে দরজা খুলে ও-পাশের কামরায় ঢুকলো। এখনই হয়তো তার কামরায় এসে পড়বে। সে একবার ভাবলো, গাড়ি থেকে লাফ দেবে; কিন্তু তাতে বিপদ যথেষ্ট। সে মরেও যেতে পারে; না মরলে হয়তো হাত-পা জখম হবে। তার ওপর পুলিশে ধরবে। তার চেয়ে বরং—কিন্তু এ কামরাটায় তো তাও নেই। তবে কী বেঞ্চির নিচে লুকোবে? তাতেও কী রক্ষা আছে? চেকারের চোখ সব জায়গায় যায়। বিনা টিকেটে রেলে চড়া সত্যিই ভারি অন্যায়। এবারটা যদি কোন রকমে সে রক্ষা পায়। সে জানলা দিয়ে দেখলো, পরের স্টেশন কতদূর? কিন্তু সামনে কিছুই তো দেখা যায় না। দু'পাশে তারের বেড়া; মাঝে রেল-লাইন চলে গেছে সোজা। ইনজিনের কালো ধোঁয়ায় সামনেটা অন্ধকার। ভোম্বোল ভাবলো, লাফই দেবে। সে বেশ শক্ত কোরে কোমর বাঁধলো; হাঁটুর নিচের কাপড় তুলে তার ওপর দিকের খানিকটা কোমরে গুঁজলো।

সে দরজা খুলবার জন্যে মুখ বাড়াতেই দেখলো, সামনে ঐ যে সিগ্‌ন্যাল দেখা যায়। সিগ্‌ন্যালটা যেন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কে হাসছে। আর, স্টেশন আসবারও দেরি নেই। কিন্তু গাড়িখানা তো তেমন জোরে চলছে না! ইনজিন-ড্রাইভারের ওপর তার খুব রাগ হলো! লোকটা অ-কর্মা! জানে না, কিছুই জানে না। খুব সম্ভব ড্রাইভার পাঁউরুটি খাচ্ছে; আর, ফায়ারম্যান গাড়ি চালাচ্ছে। এ সব লোকের শাস্তি হওয়া উচিত।

ভোম্বোল আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল। সর্বনাশ! চেকারটাও যে বাঘের মতো মুখ বাড়িয়ে আছে। তবে কী হবে? যদি এখনই তার কামরাটায় আসে। ইনজিন-ড্রাইভারকে ধ'রে তার

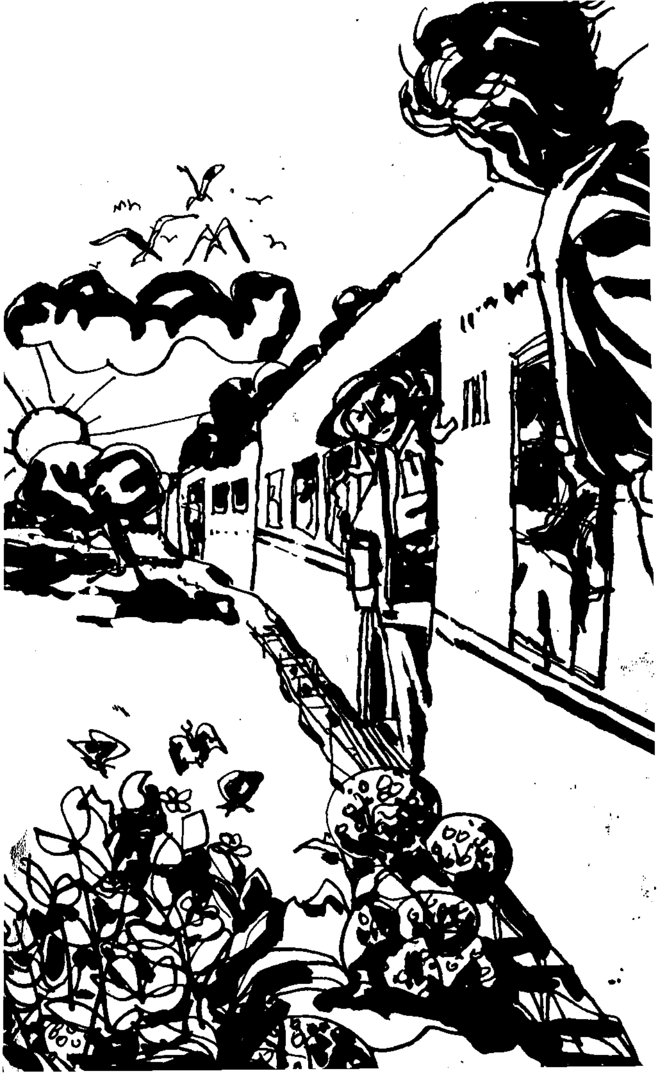

মারতে ইচ্ছে হ'লো। জোরে চালাও---জোরে---আঃ! এ কী? গাড়ি ক্রমে থেমে যাচ্ছে যে! ভোম্বোল এবার বিপরীত দিকের জানালার কাছে ছুটে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখলো—ঐ যে স্টেশন এগিয়ে আসছে। সে চট্ করে দরজা খুলে ফেললো। তারপর গাড়ি থামতে না থামতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে, প্ল্যাটফরমে নেমে, ছুটে তারের বেড়া গলিয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তাকে ধরে কে? গাড়িখানাও মিনিটখানেক পরেই হুইস্‌ল্ দিয়ে 'ব্যাশ্! ব্যাশ্' শব্দে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

পাঁচ

শালুকডাঙায়

ছোট স্টেশন।

প্ল্যাটফরমের প্রায় মাঝামাঝি একখানা ছোট খড়ের ঘর। তার বেড়া চাটাইয়ের। গায়ে ছোট একটি জানলা। তার তলার দিকে কাঠের ঘুল-ঘুলির ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে যাত্রীরা টিকিট কেনে। বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে ও প্ল্যাটফরমের দুই মাথায় বোর্ডে ইংরেজী ও বাঙলায় বড় বড় কালো হরফে লেখা—শালুকডাঙা।

ততক্ষণে রোদের তেজ বেশ বেড়েছে।

ভোম্বোল চারধারে তাকিয়ে দেখলো, শালুক ফুলতো দূরের কথা, কোথাও একটা পুকুরও নেই। কেবল দিকে দিকে জলে ভরা আমনের ক্ষেত; ধানের কচি শিষ ও পাতাগুলো বাতাসে খেলা করছে। মধ্যখানে একটি উঁচু জায়গায় একখানা গাঁ; জল থেকে পা গুটিয়ে যেন জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। স্টেশন থেকে একটা কাঁচাপাকা রাস্তা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে গাঁয়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সেই পূবে—অনেক দূরে। রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় ঝাঁক্ড়া গাছ, ঠিক যেন এক একটা ছাতা বসানো।

স্টেশন থেকে ছইয়ে ঢাকা একখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল গাঁয়ের দিকে। ছইয়ের পিছন দিকটা একখানা ডোরাকাটা আধময়লা চাদরে ঢাকা—মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হচ্ছে। বোধহয়, ভেতরে কোন বউ আছে।

হঠাৎ একখানা বাইসিকল গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। যে বাইসিক্ল চালাচ্ছে, তার মাথায় শাদা পাগড়ি, গায়ে কালো কোট। সে গরুর গাড়িখানার সামনে এসেই ঘণ্টা বাজালো—টিঙ্-টিঙ্, টিঙ্-টিঙ্।

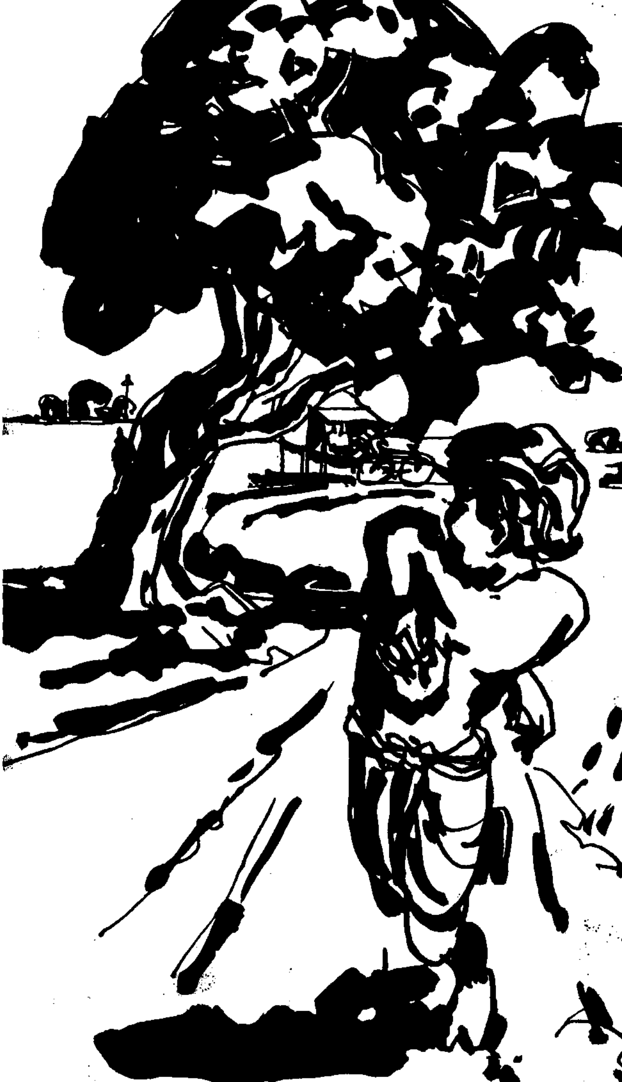

গরু দুটো বাইসিক্ল দেখে হঠাৎ ভড়্‌কে গিয়ে বড় বড় চোখ বা'র ক'রে রাস্তা থেকে ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে দিলে দৌড়। ভোম্বোল হাসি আর চাপতে পারে না। গরু দুটো লেজ তুলে ছুটতে ছুটতে এক একবার মাথা নিচু ক'রে জোয়াল খোলার চেষ্টা ক'রে; কিন্তু লম্বা শিঙ জোড়ায় আটকে যায়—পারে না। শেষে অনেক চেষ্টা ও কষ্টের পর গরু দুটো বাগে এলো; গাড়িখানা ক্ষেতের জলকাদার মধ্য দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার রাস্তায় উঠে চলতে লাগলো।

স্টেশনের ও-ধারে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ। তার তলায় একখানা ময়রার দোকান।

ভোম্বোল রেল-লাইন পার হয়ে দোকানের সামনে গিয়ে দেখে ময়রার পো মাথা নিচু করে মেঝেয় পাতা চাটাইয়ে বাতাসা কাটছে। সে ভোম্বোলের দিকে ফিরেও তাকালো না। ভোম্বোলের পেট তখন ক্ষিদেয় জ্বলছে। গরম গুড়ের গন্ধে তার জিভে জল এলো; কিন্তু রাস্তার দিকে তাকিয়েই তার আক্কেল গুড়ুম! বাইসিক্‌ল-আরোহী ততক্ষণে তার কাছে এসে পড়েছে। আরে! এ যে চক্রবর্তী-মশাইয়ের ছোট ভাই—ষষ্ঠী খুড়ো। ষষ্ঠী খুড়ো ঠিকেদারি করে বেড়ান। খুড়ো নিশ্চয় তাকে দেখেছেন। তবু সে ছুটে দোকানের পিছন দিকে পালালো। ভয়ে তার বুক টিপ্ টিপ্ করছে।

দোকানের পিছনে ঘন ভাঁটজঙ্গল ও কচুবন। তার মধ্যে গোটা কয়েক জলবিছুটির গাছও ছিল। একটার পাতা ভোম্বোলের পায়ে লেগে গেল। ইঃ! পা-খানা বেজায় কুট্‌কুট্ করছে। সে জায়গাটা চুলকোতে চুলকোতে দোকানের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালো।

পিছনে জলে ভরা আমনের ক্ষেত—দোকানের সামনে দিয়ে রাস্তা ফাঁকা। পালাবারও উপায় নেই। তবুও সে একবার ভাবলো ক্ষেতের মধ্যে নেমে যায়। কিন্তু জলে মষে-জোঁকও থাকতে পারে। একটা যদি পায়ে লাগে তো রক্ষা নেই। তার চেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই দেখা যাক, খুড়ো কী করেন।

সে আঙুল দিয়ে চাটাইয়ের বেড়া একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকে একটা চোখ রেখে দেখলো—খুড়ো বাইসিক্‌লখানা দোকানের সামনে ঝাঁপের তলায় পাতা বেঞ্চির গায়ে হেলান দিকে রাখলেন।

দোকানি এবার মাথা তুলে দেখলো ; দেখেই বললে,—'পেন্নাম হই, দা' ঠাকুর।'

ষষ্ঠী খুড়ো বেঞ্চির একধারে বসে বললেন,—'মাখোন, এক ছিলিম তামুক খাওয়া তো—'

দোকানি অমনি হাঁক দিলে,—'ও রে! মাদোব—মাদো—ও—ও—ব্! ছোঁড়াটা থাকে থাকে, আর পালায়। কেবল ইস্টিশনে গিয়ে বসে থাকে—'

খুড়ো বললেন,—'আরে! এই তো এখানে দাঁড়িয়েছিল দেখলাম।'

ভোম্বোল খিল্ খিল্ করে হাসলো। খুড়ো তাকে মাধব ঠাওরেছেন।

মাখন বললে,—'আমিও যেন দেখলাম। আচ্ছা, আমিই হাত ধুয়ে দিচ্ছি।'

খুড়ো 'আচ্ছা' ব'লে কোটের পকেট থেকে একখানা কালো ডাইরি আর তার পুটে আটকানো মাথায় নিকেলের টুপি-পরা একটি কপিং পেনসিল টেনে নিয়ে ডাইরির পাতা ওলটাতে লাগলেন।

তাঁর মুখ অন্যদিকে। ভোম্বোল দেখলো, এই সুযোগ। সে ঘরের পিছন থেকে সরে গিয়ে রাস্তায় উঠেই গাঁয়ের দিকে দিলে ছুট্।

ছুট্—ছুট্। ভোম্বোল ছোটে আর পিছন ফিরে তাকায়। দেখে, ষষ্ঠীখুড়ো কী করছেন। খুড়ো তখনও তেমনি ভাবে বসে আছেন। কিন্তু যদি হঠাৎ ঘাড় তুলে, মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকান! একবার ঐ পথের বাঁকে বড় ঝোপটার আড়ালে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। কিন্তু বাঁকটাও কাছে নয়। ছুটতে ছুটতে তার দম বন্ধ হবার মতো হলো। আর কয়েক কদম।

ব্যস্! সে এসে পড়েছে।

ঝোপটার হাত কতক তফাতে একটা কাঁঠাল গাছ। ভোম্বোল তা'র তলায় ব'সে হাঁফাতে লাগলো। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল পেলে ভাল হোত। কিন্তু কোথায় খাবার জল? দু'পাশে ধান-ক্ষেতে যে জল রয়েছে তা খেলে নিশ্চয় অসুখ করবে। গাঁখানা সেখান থেকে তখনও আধ-মাইলটাক তফাতে। তবে তার এধারে যেন পথের পাশে একখানা ঘর দেখা যায়। ঘরখানার খড়ের চাল দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

ততক্ষণে রোদ বেশ খরখরে হয়ে উঠেছে। শরতের রোদ গায়ে বেঁধে, মাথা পোড়ায়, আবার তাতে মনও কেমন করে। ভোম্বোল ওপর পানে তাকিয়ে দেখলো, আকাশে শাদা-কালো মেঘ, যেন পাল পাল রাজহাঁস ডানা ছড়িয়ে দূরে কোথায় উড়ে চলেছে। গাঁয়ের ওপর দিয়ে, ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পথে তার গায়ে-মাথায়ও তাদের কোমল সচল ছায়া আরাম বুলিয়ে যাচ্ছে।

সে ষষ্ঠী খুড়োর ভয়ে ঝোপের কোলে কোলে সেই ঘরখানার দিকে এগোতে লাগলো।

সেখানে পৌঁছে দেখে, সেটা একটা কামারশালা। হটর্, ভরর্ ভর্র—হঠর্ ভরর্ ভরর্ করে হাপর চলছে ; আর, চুল্লীর আগুন সাপের মতো চার-পাঁচটা লকলকে লাল ফণা তুলে শব্দ করছে—সোঁ, সোঁ। কর্মকার লাঙলের ফলা, কাস্তে ও হেঁসে গড়ছে। তার কাছাকাছি দু-তিনটি চাষী উবু হয়ে বসে দেখছে। ভোম্বোলের অনেক দিনের ইচ্ছে, সে একখানা বেশ বড় ছুরি তৈরি করে। ছুরিখানা এমন ধারালো হবে যে, আঙুল ঠেকালেই কুচ্ করে কেটে যাবে। কিন্তু সে কর্মকারকে ছুরির কথা না বলে, বললে,—'একটু জল খাওয়াবে গো?'

লোকটার মাথায় একখানা ময়লা, তেলচিটে ন্যাক্‌ড়া টুপির মতো জড়িয়ে পিছনে ছোট্ট খোঁপার মতো পুঁট্‌লি পাকানো। পরণের কাপড়খানা ময়লা, কালো ঝুল, গায়ের রঙও পোড়া লোহার মতো—কিন্তু শরীর বেশ বলিষ্ঠ। লোকটা একখানা কাস্তে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আগুনে পোড়াতে পোড়াতে চোখ তুলে দেখলো। সে ভোম্বোলকে কোনদিনও দেখে নি। তার খুব আশ্চর্য বোধ হলো ; জিগ্যেস করলে,—'তোমার বাড়ি কোথায়?'

ভোম্বোল বললে,—'দুর্গাপুর।'

—‘দুগ্‌গোপুর ? সে আবার কোথায় ?’

ভোম্বোল পিছন দিকে আঙুল তুলে বললে,----‘ও-ই দিকে। বড় তেষ্টা পেয়েছে। আগে একটু জল দাও।’

‘জল ?’ বলে কর্মকার বার দুই এদিক-ওদিক্‌ তাকালো। তারপর কাস্তেখানা ‘আগুনের ওপর রেখে চাষীদের একজনকে বললে,—‘হাপর টানো। তিষ্টার জল দিতিই হয়।’ এবং ঘরের কোণে উঠে গিয়ে, একটা মেটে কলসী থেকে ছোট ঘটিতে জল গড়াতে লাগলো। কলসী, ঘটি আর তার মালিকের চেহারা দেখলে, সে জল খেতে আর ইচ্ছে হয় না। কিন্তু তৃষ্ণার সময়ে সেই জলেই বরফ দেওয়া জলের মতো তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। জল খেয়ে ভোম্বোল আর দাঁড়ালো না, গাঁয়ের দিকে চলতে লাগলো।

অদ্ভুত কীর্তি

দূরে—পিছনে—স্টেশন ; সামনে ঐ যে গাঁ।

গাঁখানি বেশ বড়। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকতেই দেখলো, বাঁ-দিকে কুমোর-বাড়ি। দুর্গাপুজোর আর দেরী নেই। কুমোরের পো একখানা দুর্গা-ঠাকুর গড়ছে।

ভোম্বোলের ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। সে কাপড়ের খুঁট থেকে নাসপাতিটা খুলে কামড়ে কচ্‌ কচ্‌ করে খেতে লাগলো। খেতে খেতে দেখলো, কুমোর-বাড়ির পিছন দিকে বেড়ার ধারে একটা মস্ত বাতাবী লেবুর গাছ। গাছটা লেবুতে ভরা। লেবুগুলো পেকে সোনার তালের মতো দেখাচ্ছে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কেউ নেই। সে কাপড়খানা গুছিয়ে পরে কাঠ-বেরালীর মতো তর্‌ তর্‌ করে গাছে উঠে গেল। গাছটা ঘন ঘন দুলছে। ডাল-পালার সর্‌ সর্‌ শব্দ হচ্ছে। ভোম্বোল পট্‌ করে একটা লেবু ছিড়তেই বাড়ির ভেতর থেকে একটা মেয়েলী গলা চেঁচিয়ে উঠলো,—‘গাছে কে রে ?’

ভোম্বোল সাড়া দিলে না। লেবুটা এক হাতের বগলে চেপে ধরে সে সড়্‌ সড়্‌ করে গাছ থেকে নামতে লাগলো। কুমোরের বউ রান্না চড়িয়েছিল। সে বাড়ির ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ভোম্বোলকে লেবুবগলে গাছ থেকে নামতে দেখে গরম খুন্তি হাতে ছুটে এসে চীৎকার করতে লাগলো,—‘চোর—চোর। লেবু চুরি করে পালাচ্ছে।’

তার চীৎকার শুনে কুমোর ওদিক থেকে কোঁৎকা হাতে ছুটে এসে একেবারে গাছের গোড়ায় দাঁড়ালো। ভোম্বোল তখনও গাছে। আর হাত দুই নামলেই উঁচু বেড়ার মাথায় পা রাখতে পারে।

কুমোর ও কুমোরের বউ গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোৎকা ও খুন্তি উঁচিয়ে বলতে লাগলো,—‘আয় নেমে। নাম্‌ শিগ্‌গির্‌—’

ভোম্বোল দেখলো, নামলে আর রক্ষা নেই। না নামলেও ওরা লোকজন জড় করে তাকে গাছ থেকে টেনে নামাবে। তখন পালাবার পথ বন্ধ। সে বললে,—'নামছি বাপু। ক্ষিদের সময় একটা লেবু নিয়েছি—'

কুমোর বললে,—'ক্ষিদে পেয়েছে তো আমার গাছে চড়েছিস্ কেন? বাড়ি গিয়ে ভাত খা। কার ছেলে তুই?'

ভোম্বোল বললে,—'চাকী মশাইয়ের।'

'কোথাকার চাকী? তোকে তো কোনদিন দেখিনি।'

কুমোরের বউ বললে,—'ও সব মিছে কথা। ছোঁড়া চোর—'

এ কথায় ভোম্বোলের খুব রাগ আর অপমান বোধ হলো। ভাবলো, লেবুটা ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরে পড়ে চলে যায়।

কুমোর হুমকি দিয়ে বললে,—'কৈ, নামলি নে? উঠবো গাছে?'

ভোম্বোল বললে,—'উঠেই এস না।'

'তবে রে!' বলেই কুমোর গাছে উঠতে লাগলো। গাছটার দক্ষিণে কুমোরের রান্নাঘর। গাছের কয়েকটা ডাল একেবারে চালের সঙ্গে লেগে আছে।

কুমোরকে গাছে চড়তে দেখে, সে আবার ওপরে উঠতে লাগলো।

দুজনেই গাছে চড়তে ওস্তাদ। তবে ভোম্বোলের এক সুবিধা, সে ছোট, শরীর হালকা। কুমোরের চেয়ে কিছু তাড়াতাড়িই উঠছে।

কুমোর-গিন্নী নিচে থেকে খুন্তী দুলিয়ে বলছে,—'ধর—ধর। ছোঁড়ার ঠ্যাং চেপে ধর।'

গোলমাল শুনে পাড়ার কয়েকটা ছেলে সেখানে ছুটে এলো। তা'রা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে লেবুগাছটার উঁচু ডালে কুমোর-পো আর একটা অচেনা ছেলে। গাছটা খুব দুলছে। তারা চীৎকার করে উঠলো।

ভোম্বোল দেখলো, সর্বনাশ! আর বোধহয় পালানো যাবে না। কুমোর তাকে ধরে ধরে। তবুও পালাবার চেষ্টা করা যাক্। দেখলো,

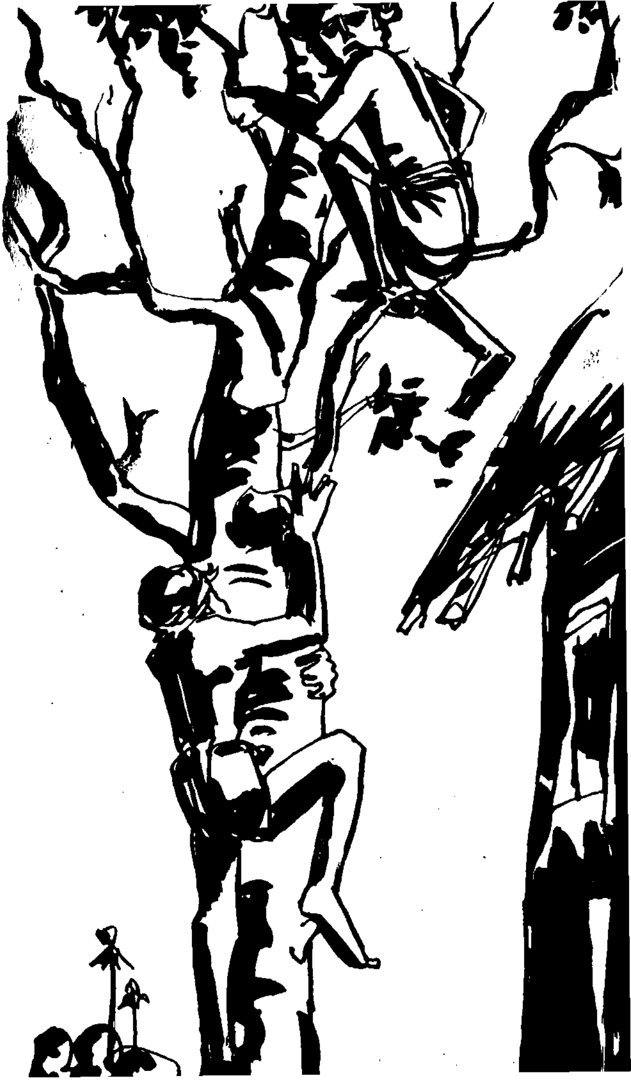

সামনেই রান্নাঘরের চাল। সে সর্‌-সর্‌ করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে চালে লাফিয়ে পড়ে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরে মাটিতে নেমেই দিলে ছুট্‌। বগলে বাতাবী লেবুটা তেমনি রয়েছে।

কুমোর-পো-ও 'ধর্‌-ধর্‌' বলতে বলতে চালে নেমে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে হাত-কয়েক ছুটেই গোবরে পা হড়কে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

ছেলেগুলো চীৎকার করতে করতে হাততালি দিতে লাগলো। তারা ভারি খুশী। লোকটা তাদেরও লেবু খেতে দেয় না!

সামনে বাঁশ-ঝাড়। তারপর ডোবা। ডোবার ধারে ঘন ঝোপ-ঝাড়। তার ওধারে ঐ যে সড়ক দেখা যায়। ভোম্বোল বাঁশ-তলা দিয়ে সেদিকে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে দেখলো—কেউ নেই! কেবল কুমোর-গিন্নীর খ্যান্‌-খেনে গলা শোনা যাচ্ছে—'ডাকাত—পাজী—ছুঁচো—ও---ও-- !'

সাত

বুড়ীর বাড়ি

ভোম্বোল হাঁফাতে হাঁফাতে চলেছে।

পথের দু-ধারে খড়ের বাড়ি-ঘর। চালে চালে চাল-কুম্‌ড়ো আর লাউয়ের গাছ। চাল-কুম্‌ড়ো গাছ্‌গুলোর কোন কোনটায় চাকা-চাকা হলদে ফুল ধরেছে, জালি পড়েছে। ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। কোন কোন বাড়ির বার-উঠোনের শেষে ধানের মরাই, কারুর বাড়ির বাইরের দিকে গোয়াল।

রাস্তার ধারে এক জায়গায় আমতলায় কতকগুলো ছেলে জটলা করছিল। কয়েকজন একটা কুকুরের লেজের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে একটা কানেস্তারা বাঁধছে। কুকুরটা বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভোম্বোলও দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

ছেলেগুলো দড়ি বেঁধে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে। কুকুরটাও অমনি দিলে ছুট্। সে যত ছোটে ততই টিনের ধমাধম আওয়াজ হয়। ছেলেগুলো হাসতে হাসতে, হাততালি দিতে দিতে তার পিছনে ছুটতে লাগলো। ভোম্বোল হেসেই সারা।

সে আবার চলতে লাগলো। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে দেখলো, কুকুরটা মাঠ দিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। লেজে দড়িটা বাঁধা, কিন্তু কানেস্তারাটা নেই!

ভোম্বোল আরও কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বেত-ঝোপের কোলে বসে পড়লো। রাস্তাটার ওপারে খান দুই ছোট খড়ের ঘর। একটা চাল-কুমড়ো গাছ। লম্বা কঞ্চি বেয়ে একটার চালে লতিয়ে উঠেছে। বাড়িটার চারধারে অড়হর-কাঠির বেড়া। সামনে একটু উঠোন—পরিষ্কার, তকতকে। আর, সেখান থেকে কিছু তফাতে। অনেককালের একটা পুকুর—দাম-কলসী-হিন্‌চে ভরা। তার পাড়ে কয়েকটা নারকোল গাছ। ঐ যে পুকুরটার ভাঙা ঘাট দেখা যায়।

বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কপালে তার ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছে। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে ভোম্বোলের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে বাতাবী লেবুটা কোলে রেখে হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে দেখলো, ঘর দুখানার ঐ কোণ থেকে এক বুড়ী কাকে যেন বকতে বকতে বেরিয়ে এলো। বুড়ীর চুলগুলো পাটের মতো সাদা, মুখে একটাও দাঁত নেই।

বুড়ী চেঁচিয়ে বললে,—'শুনছিস্ হতভাগী, এটুক্ খেয়ে যা সারাদিন এর-ওর বেড়ার ধারে ঘুরবি, মার-ধোর খাবি। নোকে কয়, আমি তোরে খেতে দিই নে। কৈ? এলি? ও সুরো—সুরো! আর মুখপুড়ীর সাড়া নেই! এতক্ষণ পাড়া মাথায় করছিলি যে—'

ভোম্বোল মনে করলো, বুড়ী বুঝি তার নাতনীকে বকছে। বুড়ী গুটি গুটি এসে পথের ওপর দাঁড়ালো। ভোম্বোল এবার দেখলো, বুড়ীর হাতে একখানা মাজা কাঁসি, বুড়ী আবার ডাকলো,—'ও সুরী-সৈরভী ধন—'

এবার সে সাড়া পেলো—'হাম্ বা-আ—আ।' সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে হুড়্ মুড় করে বেরিয়ে এলো। একটা শাদা রঙের গাই, তার পিছনে লাল রঙের বাছুর।

ওরই নাম সৈরভী? ভোম্বোল আপন মনে হাসতে লাগলো।

বুড়ী বললে,—'ওরে, এই ফ্যানটুক খেয়ে যা—আয়—

সৈরভী বুড়ীর দিকে বড় বড় চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে, মাথা দুলিয়ে, কান ঘুরিয়ে লেজ তুলে ওধারে ঝিঙে ক্ষেতের দিকে দিলে দৌড়।

বুড়ী কাঁসির ফেন পথের ধারে ঘাসের ওপর ঢেলে দিতে দিতে বকর্-বকর্ করতে লাগলো।

বুড়ী এতক্ষণ ভোম্বোলকে দেখতে পায় নি। চোখ ও ভ্রুকুঁচকে ভোম্বোলকে কিছুক্ষণ দেখলো। তারপর বললে,—'ওখানে বসে কে রে?'

ভোম্বোল বললে,—'আমি।

—'নাম কী?'

—'ভোম্বোল।'

বুড়ী কানে হাত দিয়ে ঘাড় কাৎ করে জিগ্যেস করলে,—'কী বল্লি? টম্বোল?'

ভোম্বোলের রাগ হলো; চেঁচিয়ে বললে,—'না—না—না—ভো-ও-ম্বোল।'

বুড়ী বললে,—'তাই যাই হোক! তুই ওখানে বসে কেন? সরে আয়—সরে আয়। ওখান থেকে সেদিন মস্ত এক কেউটে বেরিয়েছিল। রেখো মালোর ব্যাটা ছিমন্তটা আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কী!'

ভোম্বোল এক লাফে সেখান থেকে উঠে এসে বুড়ীর সামনে দাঁড়ালো। তারপর ঝোপটার দিকে সভয়ে তাকালো।

বুড়ী বললে,—'কাদের ছেলে রে তুই?'

—'চাকী মশাইয়ের।'

—'চাকী মশাইয়ের? এ গাঁয়ে তো চাকী নেই। বাড়ি কোথায়?'

ভোম্বোল বললে,—'সে তুমি চিনবে না।'

—'বল্ই না। দেখি চিনতে পারি কী না—'

ভোম্বোল বললে,—সে-ই দুর্গাপুর।'

—'দুগ্গোপুর? দুগ্গোপুর আর চিনি নে? রেলে যেতে হয়। আমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি ছিল ওখানে—'বলতে বলতে বুড়ীর শুক্নো চোখ দুটো ছল্-ছল্ করে উঠলো। তারপর বললে,—'তারা। আর কে-উ নেই। নাতিটাও চলে গেছে! তা তুই যে এ গাঁয়ে এসেছিস্? এখানে কেউ আছে নাকি?'

—'না।'

—'তবে?'

ভোম্বোল উত্তর দিলে না।

বুড়ী বললে,—'বুজিছি। আমার নাতিটাও এমনি করতো—ঘরে থাকতে চাইতো না। তোরা সব বুনো—বাঁদর—ঘরে মন বসে না। তোর বাপ আছে?'

ভোম্বোল নেড়ে বললে,—'না।'

—'মা?'

—'না।'

বুড়ী বলে উঠলো—'আ পোড়াকপালে? সব খেয়েছো? তবে আর তোকে ধরে রাখবে কে?'

তারপর ভোম্বোলের খুব কাছে সরে গিয়ে তার থুৎনিতে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—'কিছুই খাস্ নি বুঝি? মুখখানা শুকিয়ে গেছে দেখছি। সেটাও এমনি না খেয়ে বনে-বাদাড়ে, পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। চল্—ঐ আমার ঘর। যাহোক্ চারড্ডি জলপান মুখে দিবি। চল্—চল্—'

ভোম্বোল কিন্তু সেখান থেকে নড়লোনা।

বুড়ী বললে,—'লজ্জা করিস্ নি। চল্—চল্—বলতে বলতে ভোম্বোলের হাত ধরে টানতে টানতে তার বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

বুড়ীর ঘরের দাওয়াটি বেশ নিকোনো। এক কোণে রান্না হয়। হাঁড়ি-কুঁড়ি সব তখন তে-কাঠায় তোলা। খালি উনুনের পাশে এক বোঝা বাঁশ ও কাঠ। তার পাশে একটা ছাই রঙের বেরাল তপস্বীর মতো চোখ বুজে বসেছিল। সে তাদের পায়ের শব্দে যেন অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে মিহিসুরে একবার ডাকলো,—'ম্যাও—'

বুড়ী বললে,—'তোমার আবার কী? একটু সবুর করো।' বলে দাওয়ায় উঠে দরজার শিকল খুলে ঘরে ঢুকলো। তারপর একখানা নলের চাটাই এনে দাওয়ায় পেতে ভোম্বোলকে বললে,– 'নে—উঠে এসে বোস্।'

ভোম্বোল তখনও ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ীর কথায় আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে চাটাইয়ের ওপর বস্লো।

বুড়ী আবার ঘরে ঢুকে একটা হাঁড়ি থেকে দু'কুন্‌কে টাটকা মুড়ি একটা ধামীতে ঢাললো। তারপর শিকের হাঁড়ি থেকে বড় বড় দুটো নারকোল নাড়ু বার করে মুড়িগুলোর ওপর রেখে বাইরে এসে ভোম্বোলের হাতে দিয়ে বললে—'খা মণি।'

ভোম্বোল বুড়ীর হাত থেকে ধামীটা নিতে নিতে বললে,—'এই বাতাবীটা কী করবো, আজীমা ?'

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। এক গাল হেসে বললে,—'কী বলে ডাকলি ?'

—'আজীমা।'

বুড়ীর আনন্দ আর ধরে না। সে ভোম্বোলের সামনে উবু হয়ে বসে পড়লো। হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলে,—'ও লেবু তুই পেলি কোথায় ?

—'কুমোর-বাড়ির গাছে।'

—'মতে কুমোরের গাছের লেবু? খাস্ নে বাছা—সইবে না। তোরে আমি ভাল লেবু খাওয়াবো। ওটা ফেলে দে। অমন হাড়-কিপ্টে আমার সাড়ে তিনকুড়ি বয়সেও দেখিনি—'

ভোম্বোল লেবুটা কিন্তু ফেললো না ; পাশে রেখে দিয়ে মুড়ি-লাড়ু খেতে লাগলো। বুড়ী তাকে একটি ছোট কাঁসার ঘটিতে জল এনে দিলে। ঘটিটি রূপোর মতো ঝক্ ঝক্ করছে। তারপর বললে,—'ব'সে ব'সে খা। আমি চারটে কলমী শাক তুলে আনি। আর, দেখি গে যদি এক-আধটে ল্যাটা-পুঁটি পাই—'

ভোম্বোলকে সে দুপুরে খেতে দিলে আউস-চালের রাঙা ভাত, ঘন কলায়ের ডাল ও কাঁচা লংকা দিয়ে কলমী শাক ভাজা। সে ল্যাটা বা পুঁটি কিছুই ধরতে পারে নি। ভাতের সঙ্গে একবাটি ঘন দুধও সে ভোম্বোলকে দিলে। তার সরখানা ঠিক কাঁথার মতো পুরু—ওপরে গর্ত গর্ত। ভোম্বোল্ দুধের সর খেতে খুব ভালবাসে। দুধটা সৈরভীর। পেট ভরে খেয়ে সে দুপুরে বেশ এক ঘুম দিলে। উঠলো যখন, বাঁশবনের মাথায় বেলা গড়িয়ে গেছে।

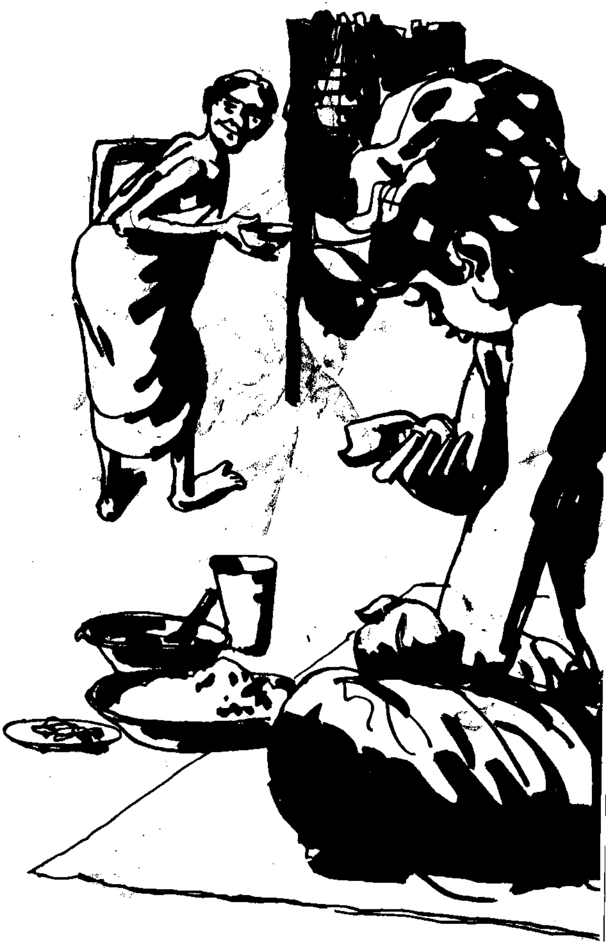

বুড়ী বললে,—'মণি, তুই আমার কাছেই থাক্। এই ঘর-বাড়ি, ঐ পুষ্করণী-বাঁশঝাড়টা আমার। বিঘে সাড়ে তিন ধেনো জমিও আছে। সব তোরে দেবো, বুঝলি?'

কিন্তু ভোম্বোল এ সব নিয়ে কী করবে? সে যাবে সে—ই টাটানগর। সেখানে গিয়ে কত কাজ শিখবে। এখানে এই গাঁয়ে, ঐ মাঠে কী আছে? এখানে সবাই যেন ঘুমোচ্ছে। ধ্যেৎ!

সে বুড়ীর কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঠিক করতে লাগলো, কলকাতা কোন্ দিকে। ঐ যেদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে? সে মনে মনে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো। হাঁ—তাই-ই। একবার কোলকাতায় গেলে টাটানগর যাওয়া কিছুই কঠিন নয়। এখান থেকে রেলেও কোলকাতা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা'হলে সে খুড়ো-মশাইয়ের লোকজনের হাতে ধরা পড়বে। তিনি নিশ্চয় চারধারে লোক পাঠিয়েছেন। কোলকাতা কতদূরই বা? তাদের দুর্গাপুর থেকে মোটে একশ' দশ মাইল। এখান থেকে না হয় একশ' ত্রিশ মাইল হবে। সে হিসেব কোরে দেখলো, রোজ যদি দশ মাইল করে হাঁটে, তা'হলে তেরো দিনে কোলকাতায় গিয়ে পেঁছিবে। তবে আর ভয় কী?

ওদিকে মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার করে এসেছিল। ঝড় ওঠে ওঠে। বুড়ী বললে,—'কোথাও যাসনে। ভীষণ দেয়া নামবে।'

সৈরভীও 'হাম্বা—হাম্বা' করতে করতে বাড়ি ছুটে এলো। বুড়ী তাকে ও বাছুরটাকে গোয়ালে পুরে মাটির গামলায় জাবন দিলে। সেদিন আর গোয়ালে সাঁজাল দিলে না। যে হাওয়া! এখনই হয়তো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে।

ভোম্বোল একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এসে দাওয়ায় উঠে বসলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকতে লাগলো। বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো ঝিলিক হান্‌ছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো, এলোমেলো বাতাস বইতে লাগলো।

বুড়ী সে রাতে আর রাঁধলো না। ক্ষীরের মতো ঘন লাল দুধে মুড়ি, মর্তমান কলা ও আখের গুড় দিয়ে দুজনে ফলার করলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে বুড়ী গল্প জুড়ে দিলে—'এক যে ছিল রাজা—তার সাত রাণী।' কিন্তু গল্পটি বেশিদূর এগোলো না, পাটরাণীর ঘরের দরজায় পৌঁছতে পৌঁছতেই বুড়ীর নাক ডাকতে লাগলো। কিন্তু ভোম্বোলের চোখে ঘুম আর আসে না।

ঘর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝর্ ঝর্, সন্ সন্। পুকুরের ব্যাঙগুলো ডাকছে—কঁ্যা-কোঁ, কটর্-কটর্। তাদের সঙ্গে দাম-কলমী-হিঞ্চে বনে এক জোড়া ডাহুক-ডাহুকী যোগ দিলে—দেই-দেই। সারা রাতের মধ্যে তাদের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকির বিরাম রইলো না। তারা সকলে যেন পরামর্শ করে ভোম্বোলের চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। তার মন ছুটে গেল তাদের দুর্গাপুরে নদী-তীরে।

সে—ই ও-পারে বন-ঝাউয়ে ঢাকা বিশাল বালু-চর। তার শেষে আকাশের কোলবরণের গাঁ। এ-পারে তাদের বাড়ি। পূব-দুয়ারী ঘরখানার জানলার ধারে এমনি বর্ষায় বসে সে যেন গান ধরেছে। ঝাউ বনে, নদীর বুকে বাতাস লুটোপটি করছে আর কী যেন কইছে…

ভোরের দিকে সব শান্ত হতে, ভোম্বোল ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর চুপিচুপি সকাল হলো। বুড়ী দেখলো, ভোম্বোল ঘুমোচ্ছে। সে পুকুর-ধারে চলে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখে, চাটাই খালি, ভোম্বোল নেই। মনে করলো, এখনই আসবে। কিন্তু ক্রমে রোদ উঠলো, মেঘ সরে গেল, ভোম্বোল তবু ফিরে এলো না। সে বেরিয়ে গিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় ডাকলো,—'টম্বো-ও-ল! ওরে টম্বলা—আয় রে দাদা—ফিরে আয়—'

কিন্তু কোথায় তার 'টম্বোল'? সে তখন আধ ক্রোশ দূরে মানিকপুরের পাকা সড়ক ধ'রে বরাবর পশ্চিম দিকে চলেছে। তার হাতে কঞ্চি, বগলে বাতাবী লেবু।

আট

যুদ্ধ

শালুকডাঙা থেকে মানিকপুর পাকা দু'ক্রোশ। মাঝে রাস্তার দু'ধারে কেবল ধান ও পাট-ক্ষেত। ভোম্বোল দেখতে দেখতে চলেছে। পাটগাছগুলোর মাথায় এক ঝাঁক গঙ্গাফড়িং উড়ছে। একটা টুনটুনি উড়ে এসে একটা পাটগাছের মাথায় বসলো। কচি-ডগা অমনি নুয়ে পড়লো; কিন্তু টুনটুনিটা উড়লো না, ব'সে ব'সে দোল খেতে লাগলো। ভোম্বোল রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে টুনটুনিটাকে ছুঁড়ে মারলো। টুনটুনিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল।

সকাল থেকেই ভোম্বোলের মনটা খারাপ। সত্যিই বুড়ী বড় ভাল। তার সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে, দুধের সরের কথা ভেবে। বেশ পুরু সর! এখনও যেন মুখে লেগে আছে। থাকলে বুড়ী রোজ খাওয়াতো! কিন্তু সর খাবার লোভে সে কী টাটানগর যাবে না? আচ্ছা! কাজ-কর্ম শিখে আবার সে বুড়ীর বাড়ি ফিরে আসবে।

এদিকে বেশ বেলা উঠেছে। রোদে গা-মাথা পুড়ে যাচ্ছে। তবে মানিকপুরও আর বেশি দূর নয়। ঐ যে গাছপালার কোলে ঘর-বাড়িগুলো দেখা যায়। গাঁয়ের বাইরে গরু-বাছুর লেজ দুলিয়ে চ'রে বেড়াচ্ছে। একটা রাখাল লকড়ি হাতে একটা গরুর পিছনে ছুটছে আর মুখে শব্দ করছে—'দুরর্ হৈঃ।'

ভোম্বোল হন্-হন্ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ে গিয়ে ঢুকলো।

গাঁয়ের মুখেই এক গৃহস্থ-বাড়ি। এক ভিখারী তার বার-উঠোনে লাউ-মাচার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় গান ধরেছে—

'কবে যাবে হে গিরিরাজ,
আনিতে মোর উমাধনে?
না হেরিয়া সে মুখ-শশী,—
আমি যে গো প্রাণে বাঁচি নে।'

সেই সঙ্গে তার একতারাটি বাজছে—বঙ্ বঙা বঙ্—বঙ্ বঙ্; বঙ্ বঙা বঙ্—বঙ্ বঙ্।

এ গান ভোম্বোলও জানে। সে বগলের বাতাবী লেবুটাতে টোকা দিতে দিতে গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে চলতে লাগলো,—'কবে যাবে হে গিরিরাজ—আ আ-আ-নিতে মোর উ—মা ধনে—এ—এ—'

এ গানের সুরে সুরে ভোরের আকাশ ছেয়ে যায়।

ভোম্বোল গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখলো, এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তার গোড়াটা কোনকালে বাঁধানো হয়েছিল। এখন সান ফেটে-ফুটে ইটগুলো দাঁত বার করে আছে। গাছটার মোটা মোটা ডাল থেকে চারধারে সাপের মতো অসংখ্য ঝুরি ঝুল্‌ছে।

ওধারে একটা মস্ত পুকুর। তার এককোণে শালুক-বন। পুকুরটাও খুব পুরনো। তার সান-বাঁধানো ঘাটও ফেটে চৌ-চির। একপাল ছেলে পুকুরে স্নান করছে। কী তাদের আনন্দ! তারা বটের ঝুরি ধরে দুলতে দুলতে পুকুরের জলে ঝপ্ করে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে; আবার সাঁতরে এসে ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছে; কেউ কেউ গাছের ডালে উঠে যাচ্ছে! চীৎকারে, ডাকাডাকিতে, জল-শব্দে জম-জমাট।

ভোম্বোলের ইচ্ছে হলো, সেও একটা ডুব দিয়ে নেয়। গরমে গা-মাথা জ্বলছে; ঘাম ঝরছে। কিন্তু আর তো কাপড় নেই। নেয়ে উঠে সে এরই এক মুড়ো পরে থাকবে, আর এক মুড়ো শুকোবে। কত মজুরকে সে তাই করতে দেখেছে।

সে কঞ্চিখানা ও লেবুটা বটগাছটার খোঁদলে লুকিয়ে রাখলো। তারপর কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বটগাছের ওপরে উঠে গেল। ছেলেরা তা'র দিকে তাকিয়ে অবাক। এ আবার কে রে? ভোম্বোল কিন্তু তাদের দিকে সোজাসুজি তাকালো না। সে ডাল দিয়ে একেবারে পুকুরের ওপর চলে গেল। তারপর একটা লম্বা ঝুরি বেয়ে নিচে নেমে, ঘন ঘন দোল খেতে খেতে দিলে এক লাফ। অমনি গিয়ে পড়লো একেবারে মাঝ-পুকুরে। পড়েই তলিয়ে গেল—জলে বুড়বুড়ি ছাড়ছে, কিন্তু সে উঠলো না।

ছেলেরা দেখলো, সে ডুবে গেছে। তা'রা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দশেক তফাতে ভোম্বোলের মাথা দেখা গেল। সে হুস্ করে ভেসে উঠলো। আবার ডুব দিলে, আবার উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ চীৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, উপুড় হয়ে সাঁতার কাটলো।

ছেলের দল সাঁতার ভুলে, কেউ ঘাটে, কেউ কোমর জলে, কেউ বা গাছের ঝুরি ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভোম্বোলের মনে খুব গর্ব হলো। ছেলেগুলো তাকে দেখ্‌ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ সাঁতার কাটতে সাহস করছে না। সে তাদের কারুর সঙ্গে কোন কথা না ব'লে, গম্ভীর ভাবে ডাঙায় উঠলো। তারপর কাপড়ের মুড়োয় গা-মাথা মুছে এ-মুড়ো, ও-মুড়ো নিঙড়ে নিলে। ক্ষিদেয় তার পেটে যেন এক ঝাঁক চড়ুই কিচির-মিচির করছে। এ সময়ে এক থালা গরম ভাত—তরকারি না পেলেও চলে। কেবল একটু নুন, কিন্তু গরম ভাত এক থালা চাই-ই। কিন্তু কে তাকে ভাত দেবে? বাতাবীটা খেয়েই কাটানো যাক্।

সে খোঁদলটার কাছে এগিয়ে গেল। নিশ্চিন্ত আছে যে, ওর মধ্যে লেবুটা আছেই। কিন্তু খোঁদলটার মধ্যে হাত দিয়ে দেখে, লেবুটা নেই, কঞ্চিখানা আছে! কে নিলে? সে তাড়াতাড়ি আবার হাত ঢুকিয়ে দিলে। না—নেই তো। বাঃ! বেশ মজা!

ভোম্বোল এ-দিক, ও-দিক তাকাতেই দেখে, একটা ছেলে লেবুটা নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। 'আমার জিনিষ চুরি?' ধর্—ধর্—ধর্। ভোম্বোল চোরের পিছনে ছুটলো। অন্য ছেলেরা এতক্ষণ ব্যাপারটা কী ঠিক করতে পারে নি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার দেখলো, তাদের নেলো পুকুর-পাড় দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটছে—তার বগলে একটা পাকা বাতাবী লেবু—আর নেলোর পিছনে ছুটছে অচেনা ছেলেটা। তারাও হৈ-হৈ করতে করতে ছুটলো।

ছুটতে ছুটতে সকলে পুকুর পার হয়ে গেল। সামনে লাহিড়ীদের লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরনো মন্দির। তার পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ। পথের ওধারে ঝোপ-জঙ্গল-কচুবন। সকলে ছুটতে ছুটতে মন্দিরের চত্বর পার হয়ে গেল।

এবার ভোম্বোল ছেলেটাকে ধরে ধরে। ছেলেটাও একবার পিছন ফিরে দেখলো। দেখেই বুঝলো, আর রক্ষা নেই। সে বগলের লেবুটা হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে গেল। অমনি ভোম্বোল ছুটে এসে খপ্ করে তার হাত চেপে ধরলো। দুজনেই হাঁফাচ্ছে। ছেলেটা হাঁফাতে হাঁফাতে বললে,—'হাত ছাড়ো!'

ভোম্বোল তার হাত থেকে লেবুটা কেড়ে নিয়ে নড়া ধরে জোর এক ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—'চোর! আমার লেবু চুরি করে পালাচ্ছিস্!'

তারও দম আটকে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে আর কথা বা'র হলো না। কিন্তু রাগে বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে কোটর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে।

পিছনের ছেলেগুলোও ইতিমধ্যে সেখানে এসে পড়েছে। তা'রা ভোম্বোলদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলেই হাঁফাচ্ছে। একজন জিগ্যেস করলে,—'কী হয়েছে? কে তুমি?'

ভোম্বোল তার কথার কোন জবাব না দিয়ে সেই ছেলেটার নড়া ধরে আবার এক ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—'কেন আমার লেবু চুরি করেছিলি?'

ছেলেগুলো একসঙ্গে ব'লে উঠলো—'তোমার লেবু? তোমার নাম লেখা আছে ওতে? ছেড়ে দাও ওকে—'

ভোম্বোল বললে,—'যা—যা। তোদের আর সর্দারি করতে হবে না। এ—ক চ—ড়ে—'

একটা ছেলে অমনি কাঁদ কাঁদ হয়ে ভোম্বোলের মুখের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলো,—ওঁরে বাঁবাঁরে—কোঁথা যাঁব—ওঁ—ওঁ—ওঁ—? এঁকটা পিঁপড়ের গাঁ—অ—র্ত—ও—উঁ—হুঁঃ—হুঁঃ।' তারপরই ধমক দিয়ে বললে,—'এখনই ছাড়্ বলছি। না ছাড়লে—বলেই সে ভোম্বোলকে এক ঠেলা মারলো।

ভোম্বোলও সঙ্গে সঙ্গে তার গালে এক চড় কষে দিলে। গালটা লাল হয়ে উঠলো।

ছেলের দল তখন রাগে, অপমানে পাগলের মতো হয়ে গেল। তা'রা চারধার থেকে ভোম্বোলকে আক্রমণ করলো। কেউ কিল মারে,

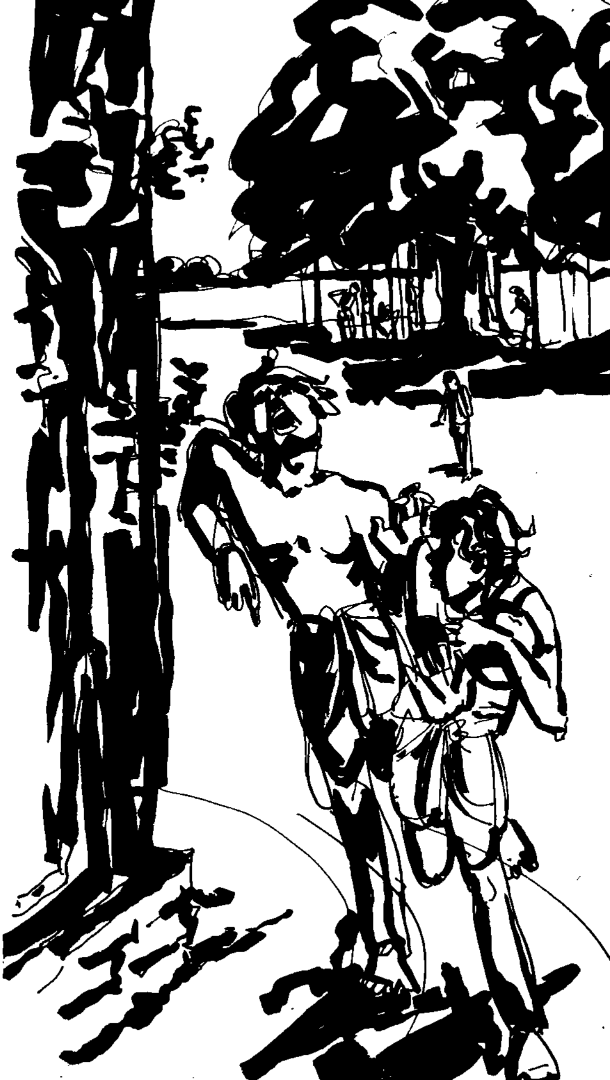

কেউ চড় মারে, কেউ খামচি দেয়, কেউ কাপড় ধরে টানে, কেউ লেংগি মারে।

ছেলেদের মার খেয়ে ভোম্বোলের চেহারা হয়ে উঠলো ভয়ংকর। তার কাকা আর স্কুলের মাষ্টার-মশাই ছাড়া আর কেউ আজ অবধি তাকে মারতে সাহস করেনি। এ গাঁয়ের ছোঁড়াদের মার সে হজম করবে? সে একহাতে বেপরোয়া ঘুসি ও লাথি চালাতে লাগলো। কারো পেটে লাগে, সে কোঁক ক'রে ওঠে; কারো পিঠে লাগে, ধম্ করে শব্দ হয়; কেউ নাক ধরে বসে পড়ে।

বেগতিক দেখে একজন বলে উঠলো,—'এই হেবো, যা তো; বাড়ি থেকে সড়কিখান নিয়ে আয়।···· জানিস্ শুয়োর! এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর?'

পথের পাশে হাত দুই লম্বা একখানা বাঁশের আগা প'ড়েছিল। ভোম্বোল চট্ করে সেটা তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগলো,—'তা'র আগে তোদের মাথা ফাটাবো। চলে আয় সব মানিকপুরী---ই---ই।'

বাঁশ দেখে ছেলেগুলো আর দাঁড়ালো না; দেখতে দেখতে চারধারের ঝোপ-জঙ্গল-গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ভোম্বোল দেখলো, আর থাকা ঠিক নয়। যুদ্ধে তো তারই জিত হয়েছে। সে বাঁশের আগাখানা কাঁধে নিয়ে যে-পথে এসেছিল, সে-পথে তাড়াতাড়ি ফিরে চললো। তার বুক-পিঠ জ্বালা করছে। একটা ছেলে খামচে একেবারে রক্ত বার করে দিয়েছে। ইঃ!

নয়

পাঠশালায়

গাঁয়ের পথে রোদ পড়ে না, কেবল ছায়া—

ভোম্বোল একটা নতুন পথে ছায়ায় ছায়ায় যেতে লাগলো। গাঁ যেখানে শেষ, সেখান থেকে আবার ক্ষেত-খামার শুরু। তার শেষে যে গাঁ তা একেবারে আকাশে মিশে আছে। মানিকপুর থেকে কতদূর হবে, কে জানে? পথটা যেন একখানা বিশাল ধনুক। ভোম্বোল একবার সেদিক পানে তাকালো। উঃ! কী রোদ। চোখ মে'লে তাকানো যায় না!

সে একটা গাছতলায় ব'সে কাপড়ের এক মুড়ো ছায়ার বাইরে রোদে মেলে দিলে। চারধারে তাকিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই— কেবল কিছু তফাতে একখানা প্রকাণ্ড টিনের আটচালা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে শব্দ আসছে—'একের পিঠে এক এ--গা--রো--ও—।' ভোম্বোল বুঝলো, ওটা, একটা পাঠশালা। ছেলেগুলো গাঁ মাথায় করে শড়কে পড়ছে।

ভোম্বোল পাঠশালাটার দিকে মুখ করে লেবুটা ছাড়িয়ে খেতে লাগলো। ভারি মিষ্টি লেবু। এই জন্যেই মতে কুমোর কাউকে খেতে দেয় না। এর সঙ্গে যদি একটু নুন্ হতো! তা'হলে কেয়া মজা!

লেবু খেতে খেতে রোদে কাপড়ের মুড়োটা শুকিয়ে এলো। ভোম্বোল সে মুড়ো পরে আর এক মুড়ো তেমনি ক'রে রোদে দিলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটাও শুকিয়ে গেল। এবার আর কোমর না বেঁধে সেমুড়োটা সে গায়ে দিলে। ক্ষিধেয় পেট তখনও জ্বলছে। একটা বাতাবী লেবুতে অমন ষণ্ডা ছেলের কী হবে? সে চারধারে তাকিয়ে

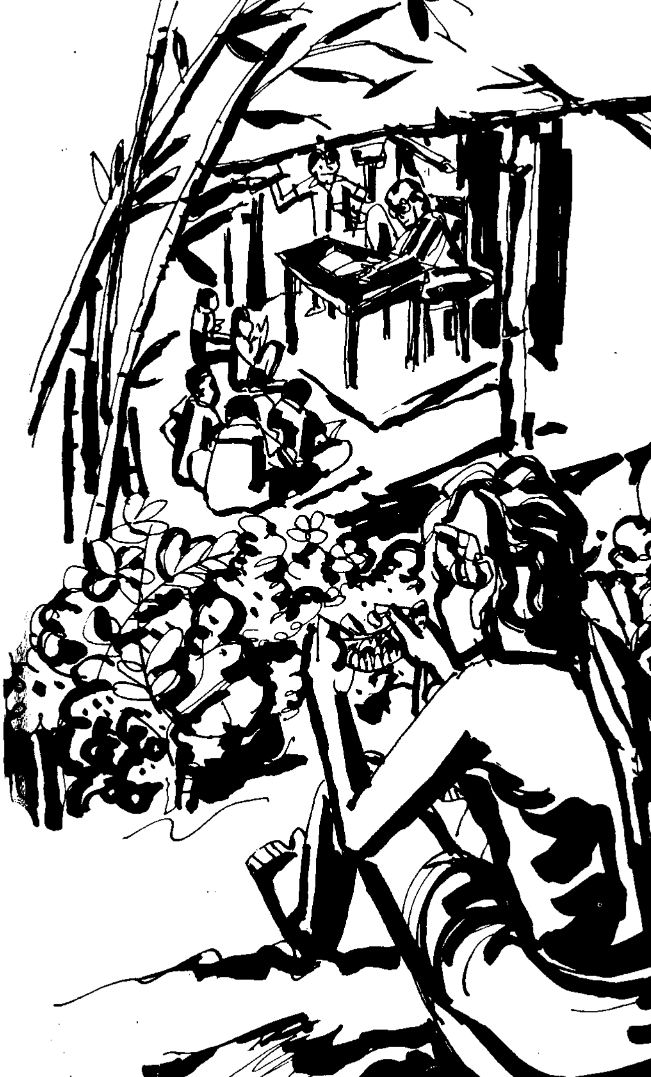

দেখলো, কোথাও কোন ফলের গাছ আছে কিনা ? বছরের এ সময়ে বাতাবী ছাড়া আর কোন ফল পাওয়া যায় ? তবে কয়েকটা ভাল ফল, এ সময়ে ফলে—কলা, নারকোল, পেয়ারা, আতা। ঐ যে পাঠশালার ওধারে কয়েকটা নারকোলগাছ ও কলার ঝাড় দেখা যাচ্ছে। এক কাঁদি কলাও পড়েছে যেন!

ভোম্বোল আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল। বেশ বড় বড় কলা। সে আরও কাছে গিয়ে দেখলো—কাঁদিটা পাকাও নয়, পাকারও নয়, কাঁচকলার। আর, নারকোলগাছে নারকোল আছে বটে, কিন্তু পাড়বে কে ? সে নারকোলগাছে চড়তে পারে না।

যাক্। কলা-নারকোল খেয়ে দরকার নেই। একবেলা না খেলে কী হয় ? ছেলেরা তখন নামতা পড়ছে—'সাতনম্ তেষট্টি—ই—ই।'

ত'ার ইচ্ছে হ'লো, একবার পাঠশালাটা দেখে যায়। সে বড় ইস্কুলের ছাত্র। পড়ে ফোর্থ ক্লাসে (ক্লাস সেভেনে)। ফোর্থ ক্লাসের ছেলের সঙ্গে চালাকি নয়। তাদের অনেক বই। অ্যালজেব্রা আর সংস্কৃত ঋজুপাঠের নাম শুনলেই পাঠশালার পোড়াদের চক্ষু রসগোল্লা। ওরা ইংরেজীরও কিছুই জানে না। কেবল জানে বাঙলা আর শুভঙ্করী। বাঙলা আবার কেউ পড়ে নাকি ? তবে হাঁ, শুভঙ্করীটা—কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে পাঠশালার সামনে এসে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলো, একঘর ছেলে। ছেলেগুলো ধাড়ী ধাড়ী, কারো কারো গোঁফ বেরিয়েছে। তাদের মাঝে পণ্ডিতমশাই একটা পুরনো টেবিলের সামনে, একখানা হাতলভাঙা চেয়ারে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। তাঁর নাকের ডগায় কালো ফ্রেমের স্টীলের বাঁকা ভাল চশমা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা। গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবীর ওপর একখানি আধময়লা উড়ুনি আলোয়ানের মতো করে জড়ানো। টেবিলের নিচে তার বহুদিনের পুরনো মাথা-বাঁকা চটি জোড়া দেখা যাচ্ছে। তাদের গোড়ালি অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে।

ছেলেদের নামতা পড়া শেষ হ'লো। কিন্তু বেজায় হট্টগোল হচ্ছে। পণ্ডিতমশাই শ্লেটের একখানা ফ্রেমভাঙা হাতে নিয়ে টেবিলের ওপর

খটাখট্ করে ঠুকলেন। অমনি গোলমাল কিছু থামলো, যেন এক ঝাঁক মৌ-মাছি গুন্‌গুন্ করতে করতে দূরে উড়ে গেল।

আরে ঐ যে! ভোম্বোল এতক্ষণ দেখে নি, একটা ছেলে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। ওর দু'হাতে দুখানা ইট। ছোঁড়াটা কী শয়তান! অমনি করে দাঁড়িয়েও কা'কে যেন জিভ ভ্যাংচাচ্ছে।

ঐ কোণে ওটা আবার কে? হাঃ—হাঃ—হাঃ! নাড়ুগোপাল! ছেলেটা মাটিতে তিন হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে নাড়ু-গোপাল হয়ে আছে। হাতে নাড়ুর বদলে আধখানা ইট।

ভোম্বোল আরও মজা দেখতে পাঠশালার বারান্দায় উঠে খুঁটি ধরে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে সেই কোণ থেকে একটা ছেলে নালিশ করলো,—'পোন্‌শাই, গোপ্‌লা আমার বগলে কাতুকুতু দিচ্ছে—এ—এ—।'

আবার পণ্ডিতমশাই খটাখট্ টেবিল ঠুকতে ঠুকতে বলে উঠলেন,—'এই! সব চুপ্!'

সেই ছেলেটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'পোন্‌শাই, আমার বগলে—এ—এ—।'

পণ্ডিতমশাই হাঁক দিলেন,—'নিয়ে আয় গোপ্‌লার কান চেপে ধরে—এ—।'

অমনি চার-পাঁচটা ধাড়ী ছেলে চারধার থেকে ছুটে গেল গোপ্‌লার কান ধরতে। যে ছেলেটা দু'হাতে কান ঢাকলো, ওরই নাম গোপ্‌লা! হাঃ—হাঃ—হাঃ! ছেলেগুলো গোপালের হাত সরিয়ে দিয়ে তার দুকান চেপে ধ'রে টানতে টানতে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে নিয়ে এলো। পণ্ডিতমশাই গোপালের ঘাড় ধরে ধমক দিলেন,—'বাঁদরটা! কেবল খুনশুড়ি!' বলেই পিঠে থপ্ করে মারলেন, এক চড়।

এদিক থেকে একটা ছেলে বললে,—'পোন্‌শাইয়ের থাবা। এই! কাঁদ্ কাঁদ্। না কাঁদলে আরও থাবাবেন।'

গোপালও অমনি 'ওঁরে ঝাঁবারে' বলে কাঁদতে কাঁদতে পিঠ বেঁকিয়ে ছুটে পালালো।

ঠিক তখনই ভোম্বোলের মনে হলো পিছনে একটা প্রকাণ্ড শুয়োর চেঁচাচ্ছে। কিন্তু ফিরে দেখে, শুয়োর নয়, একটা ছেলে! চার-পাঁচটা ধাড়ী ছেলে ছেলেটাকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে আস্‌ছে! আর, ছেলেটা হাত-পা ছুড়াবার চেষ্টা করতে করতে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। সে কিছুতেই আসবে না। ঐ ছেলেটাকে আনতে চার-পাঁচ জনেও পারছে না? হোঃ—হোঃ! ভোম্বোল তো একাই পারে! যুযুৎসুর একটি প্যাঁচে বাছাধন কাঁচপোকার মুখে উইচিংড়ির মতো হয়ে সুড়্ সুড়্ ক'রে চ'লে আসবে।

ছেলেরা তাকে এনে পাঠশালার বারান্দায় তুললো। ছেলেটা এবার এমন চীৎকার ও কান্না আরম্ভ করলো যেন তার ভয়ানক পেট ব্যথা করছে, কান কট্ কট্ করছে, দাঁতগুলোর গোড়ায় আট-দশটা পোকা কামড়াচ্ছে। কী যন্ত্রনা রে বাপ! সে কেবলই বলছে,—'আমায় ছেড়ে দেরে! ওরে বাবারে! আমি পাঠশালায় যাবো নারে—ওরে আমায় মেরে ফেললে রে—ও মা—আ—আ—হা—হা—'

পণ্ডিতমশাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও তাঁর পিছু পিছু হুড়্ হুড়্ করে বেরিয়ে এলো।

পণ্ডিতমশাই বললেন,—'নিয়ে আয় এদিকে। শুয়োরটা রোজ পালাবে—গাছে চড়ে থাকবে—'

ছেলেটা পণ্ডিতমশাইকে দেখেই কান্না গিলে ফেললো—এখন ফোঁপাচ্ছে।

পণ্ডিতমশাই তার হাত চেপে ধরে বললেন,—'চল্ ভেতরে। তোর পড়ায় এত ভয় কিসের? এরা পড়ছে কী ক'রে? চল্—'

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাঁর সঙ্গে চললো। তার দুটি গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে; কয়েক ফোঁটা বুকেও পড়েছে। তার অবস্থা দেখে অন্য ছেলেগুলোর কী স্ফূর্তি!

ভোম্বোলও হাসি চাপতে পারলো না—হাসতে হাসতে পরের গাঁয়ের দিকে চললো।

দশ

কাছিমদহর হাটে

মাঝ পথে যেতেই বেলা দুপুর—

পূব-পশ্চিম থেকে এসে আরও দুটো পথ সেই পথটার সঙ্গে মিশেছে। পথ তিনটের ধারে ধারে বাবলাগাছ। আর কোন বড় গাছ নেই। পথের ওপর তাদের কাঁটা, ছোট ছোট পাতা সেই সঙ্গে একটু একটু ছায়াও পড়েছে।

সেদিন ছিল হাটবার। পথে যেতে যেতে হাটুরেদের সঙ্গে ভোম্বোলের দেখা হ'লো। তারা বেসাতি নিয়ে চলেছে—কারুর মাথায় পাট, কারুর মাথায় গামছা, কেউ নিয়েছে এক ঝাঁকা বেগুন, কেউ বা নিয়ে চলেছে এক ধামা পেঁয়াজ। আবার, কেউ বা দুটো মড়াখেকো খাসিকে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে; খাসি দুটো যায় আর ডাকে—'ম্যা—অ্যা—অ্যা—।' কারো কারো মাথায় খালি ধামা ও পাটকরা বস্তা অথবা হাতে খালি বোতল।

ভোম্বোল একজনকে জিগ্যেস করলে,—'পথটা কোন্ গাঁয়ে গেছে গো?'

লোকটা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলে,—'তুমি যাবে কোথা?'

ভোম্বোল বললে,—'রেলরাস্তা—'

—'রেলরাস্তায়। তা' এ পথ দিয়ে যাওয়া যাবে। ঐ যে ছামনে কাছিমদয়ের হাট—ওরই ওধারে খান দুই গাঁ পরে রেলের রাস্তা। কোথা থেকে আসছো?'

—'মানিকপুর।'

—'মানিকপুর থেকে? ইদিকে কেন?'

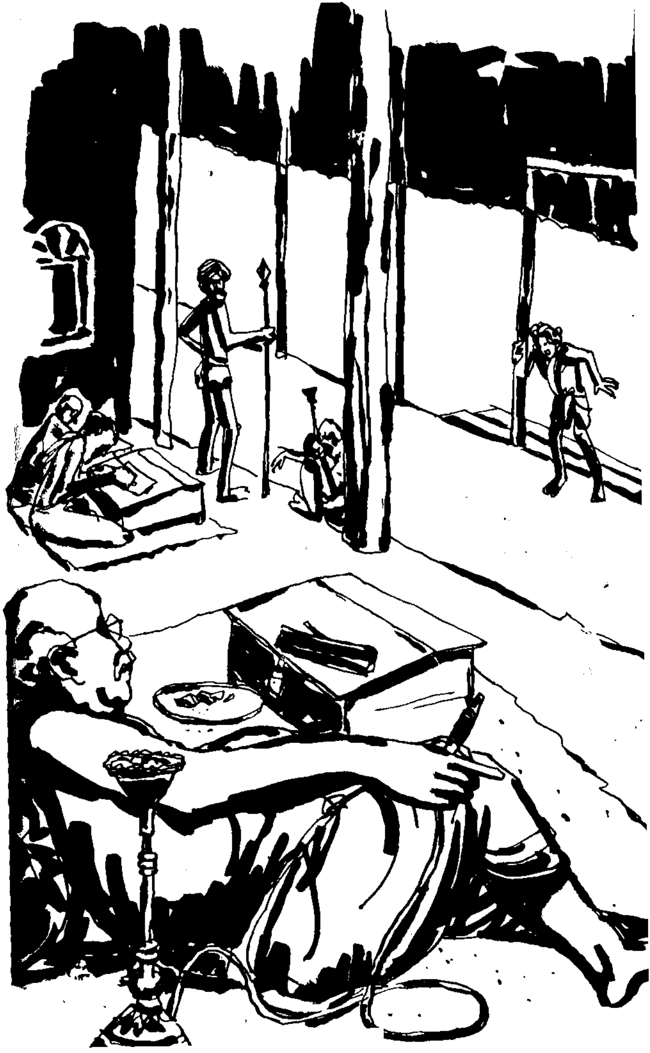

—'ঐ রেলরাস্তার ধারে এক গাঁয়ে যাব।'

—'গাঁয়ের নাম কী?'

ভোম্বোল কোন জবাব দিলে না; লোকটাকে ছাড়িয়ে গেল। লোকটা আপন মনেই বললে,—'ছোঁড়াটা সেয়ানা।'

পথও ফুরিয়ে আসছে, বেলাও গড়িয়ে গেল। ঐ যে সামনে হাট। চারধারে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। এখান থেকে হাটের মহা কোলাহলকে মনে হচ্ছে যেন বন্যার জলস্রোতের শব্দ—কল কল, কল কল।

ভোম্বোল হাটের ধারে এলো। পথের পাশেই জমিদার-কাছারি। মস্ত টিনের আটচালা। তার পাকা বারান্দায় পিয়াদা-বরকন্দাজেরা ও জন কয়েক লোক—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে; কেউ কলকেতে তামাক খাচ্ছে, কেউ-গল্প করছে। ঘরের ভেতর চৌকির ওপর ফরাসে কয়েকজন মুহুরি বসে। প্রত্যেকের সামনে একটা করে কাঠের হাতবাক্স। তারা ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখ্ছে। আর, ঐ যে খালি গায়ে চশমা চোখে বসে গড়গড়া টানছেন, উনিই বোধহয় কাছারির নায়েবমশাই। নায়েবমশাইয়ের ভুঁড়িটা বেশ—যেন জয়ঢাক।

ভোম্বোল আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠলো। নায়েবমশাইয়ের ভুঁড়িটা দেখতে বেশ মজা লাগে। হাসি পায়। সে ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে নায়েবমশাইয়ের মুখের দিকে চোখ তুলতেই ভোম্বোলের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হ'লো। অমনি মনে হলো, তাঁকে যেন সে কোথায় দেখেছে। কোথায়? কোথায়? নায়েবমশাইও এবার যেন ভোম্বোলকে চশমার ওপর দিয়ে ভাল করে দেখছেন। মিনিট খানেক লক্ষ্য ক'রেই বলে উঠলেন,—'আরে! ঐ তো আমাদের হারাণবাবুর ভাইপো ভূপেন। ওর ডাকনাম ভোম্বোল। ছোঁড়াটা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এই ইংরেজের বাপ, এই বিলাতালি, ওরে ফট্কে—ছোঁড়াটাকে ধর্—' বলতে বলতে নায়েবমশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে ফরাস থেকে নামলেন।

ভোম্বোলও এবার তাঁকে চিনতে পেরেছে। নায়েবমশাই তার কাকার বন্ধু, ব্রজ ভটচার্য। সেবার তাদের বাড়ি গিয়ে দু'দিন ছিলেন। যখন হাসেন তখন মনে হয়, একটা হিপোপটেমাস্ হাঁ করে আছে। ওঁর হাসির আওয়াজ সারা পাড়ার লোক শুনতে পায়। নায়েবমশাই

ফরাস থেকে নামতে নামতেই ভোম্বোল একলাফে নিচে নেমে হাটে মিশে গেল।

সে কারুর বগলের তলা দিয়ে, কারুর পেটের কাছ দিয়ে, কারুকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে হাটের মধ্য দিয়ে একরকম ছুটতে লাগলো। নায়েবমশাইয়ের পিয়াদা-বরকন্দাজে হাট ভরা। এখনই তাদের হাতে ধরা প'ড়তে হ'বে। ওদিকে ইংরেজের বাপ বিলাতালি, ফট্‌কে, কমরদ্দি, রত্না প্রভৃতি পিয়াদা—বরকন্দাজেরা বড় বড় লাঠি নিয়ে হাট ঘিরে ফেললো। ব্যাপারটা যে কী কেউ বুঝতে পারছে না। চারধারে গোলমাল, চঞ্চলতা আরও বাড়লো। ভোম্বোল যেতে যেতে শুনলো, একজন বললে,—'নায়েবমশাইয়ের বেটা চুরি হয়েছে—।'

ভোম্বোলের হাসি এলো। সে সামনের একজনকে ধাক্কা দিয়েই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, লোকটি ষষ্ঠী খুড়ো। খুড়ো হুম্‌ড়ি দিয়ে মুড়ি কিনছিলেন। ভোম্বোলের ধাক্কায় কতকগুলো মুড়ি ছিটিয়ে গেল। তিনি হুংকার দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই দেখেন, সামনে ভোম্বোল। ঐ দেখাই সার। ভোম্বোল ততক্ষণে দশটা লোক পার হয়ে গেছে। ষষ্ঠী খুড়ো হাঁক দিলেন,—'ধর—ধর—ঐ যায়—'

তাঁর কথা শুনে আশ-পাশের সকলে বলতে লাগলো,—'ধর—ধর—ঐ যায়।'

কিন্তু কে যায়, কোথা যায়, কেউ বুঝতে পারে না। ভয়ে ভোম্বোলের বুক টিপ্ টিপ্ করছে। এবার আর রক্ষা নেই। ধরা পড়তেই হবে।

সে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে একখানা প্রকাণ্ড বাগান দেখা যাচ্ছে। লোকজনও সেদিকে পাতলা। খান কয়েক গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নাকে দড়ি বেঁধা গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ভোম্বোল ভীড় ঠেলে বেরিয়ে—বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে বাগানের মধ্যে পড়লো। পড়েই আর দাঁড়ালো না—ছুটতে লাগলো। সারাদিনের পথচলায় শরীর ক্লান্ত। তার ওপর সকাল থেকে এক রকম উপবাসী। ছুটতে কষ্ট হচ্ছে। তাহোক। তবু সে ধরা দেবে না।

বাগানখানার ওধারে সড়ক। হাটুরেরা আসা-যাওয়া করছে। ভোম্বোল বেড়া গলিয়ে বাগান পার হয়ে সড়কে উঠলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে; তবুও বসে জিরতে সাহস হলো না, সে পথ ধরে চললো।

এগারো

পুঁটিমারীর পথে

ভোম্বোল যায় আর পিছন ফিরে তাকায়। এবার যদি কেউ তা'কে তাড়া ক'রে তা'হলে সে আর ছুটতে পারবে না। অথচ ব্রজবাবুর এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়া চাই।

কিন্তু জমিদারের পিয়াদা সব জায়গায় ঘোরে। এই রাস্তা ধ'রে কিছুদূর গিয়ে কোথাও ব'সে জিরবে। ব্রজবাবু তা'কে চিনলেও পিয়াদারা তো তা'কে চেনে না। তবে একবার দিকটা ঠিক ক'রে দেখা যাক্। ঐ তো তা'র সামনে সূর্য ঢলে পড়েছে। সে ঠিক পথেই যাচ্ছে।

পথের দু'ধারে ঘন বাঁশবন। বাতাসে বাঁশ-পাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ওলট-পালট খাচ্ছে। বাঁশগাছগুলো গায়ে গায়ে ঢলে পড়ছে। আর, শব্দ হচ্ছে—'ট্যাঁস্ ট্যাঁস্।'

একটা চাষীর ছেলে হাট থেকে ফিরছিল। তা'র মাথায় সওদা। ভোম্বোল তা'কে জিগ্যেস করলে,—'এপথ কোথায় গেছে রে?'

ছেলেটা ভোম্বোলের দিকে একবার আড়চোখে তা'কালো। তা'র কথার কোন জবাব দিলে না।

ভোম্বোল আবার জিগ্যেস করলে,—'এই, পথটা কোন্ দিকে গেছে?'

ছেলেটা আস্তে আস্তে বললে,—'পুঁটিমারী।'

—'তোর বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটা এবার চট্ ক'রে পিছন ফিরে হাটের দিকে মুখ ক'রে চীৎকার ক'রে ডাকলো,—'ও আব্বা—আ—'

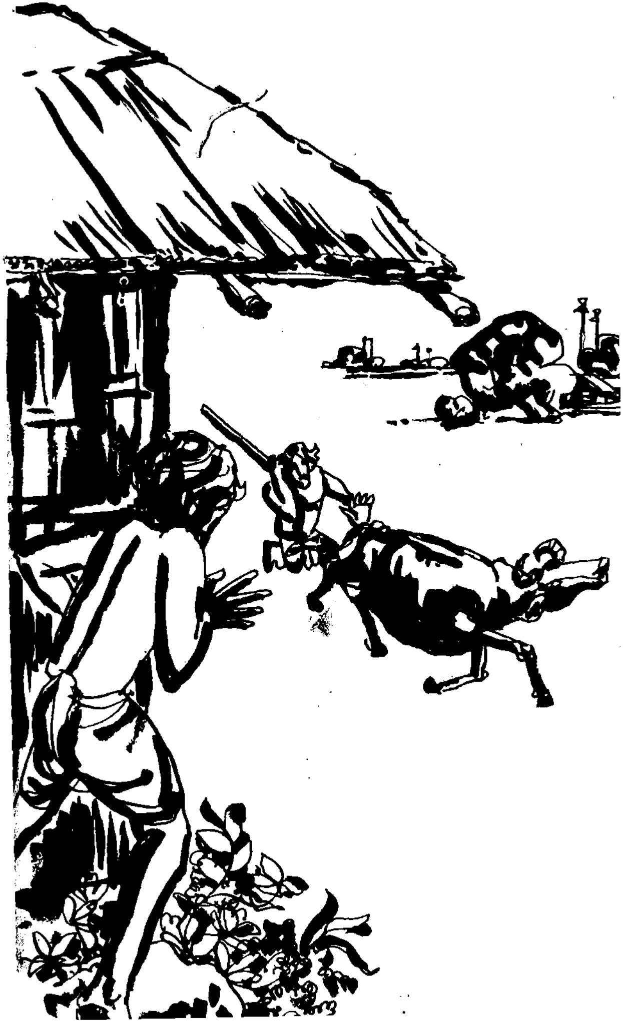

ভোম্বোলের হাসি এলো। ছোঁড়াটা ভয় পেয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে, সত্যি যেন ওর বাবা পিছন পিছন আসছে। ভোম্বোল বললে,—'ভয় কী রে? আমি পুঁটিমারী যাবো। এখান থেকে কদ্দুর বল্ না?'

ছেলেটা তা'র কথায় সাহস পাওয়া দূরে থাক্, হাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ভোম্বোলের ইচ্ছে হ'লো, বোকা ছোঁড়াটার গালে দেয় দুটো চড় বসিয়ে। আস্ত ভূত!

সেই সময় জনকয়েক লোক তাড়াতাড়ি হাটের দিকে আসছিল। ভোম্বোল তাদের একজনকে জিগ্যেস করলে,—'পুঁটিমারী কতদূর গো?'

লোকটা ঘাড় না ফিরিয়ে পিছন দিকে হাতটা একটু বেঁকিয়ে বললে,—'এই ছামনে।'

—'সামনে কদ্দুর?'

—'ঐ খাল-পার' বলতে বলতেই লোকটা চলে গেল।

কী বিপদ! গাঁয়ের মানুষ কিছুতেই দূরত্বের কথা ঠিক বলবে না। ওদের কাছে চারক্রোশ দূরের গাঁ-ও,—'ঐ যে!'

এদিকটায় পথের ধারে ধারে লোকের বসতি। কোথা থেকে যেন এসে ভোম্বোলের সমুখ দিয়ে নাকে দড়ি গাঁথা একটা মোষ উটের মতো মুখ তুলে বড় বড় চোখ বা'র ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলতে লাগলো। ভোম্বোল মোষের ডাক নকল করতে পারে। সে একবার পিছন ফিরে তাকালো। সর্বনাশ! লাঠি হাতে বাবরি-চুলো ঐ লোকটা ছুটে আসছে কে? পিয়াদা নাকি? সে এক দৌড়ে পথ থেকে একখানা বাড়ির ঘরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঘরখানা ঢেঁকি-শাল। গৃহস্থ-বউ তখন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ঢেঁকির শব্দ হচ্ছে—'ক্যাঁচোর ধপ্। ক্যাঁচোর ধপ্।' বউ বোধ হয় চিড়ে কুটছে।

ভোম্বোল ঘরখানার বেড়ার পাশ থেকে একটা চোখ বা'র করে দেখলো, লোকটা ছুটতে ছুটতে মোষটার সামনে এসে তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে তা'র পিঠে নির্দয়ভাবে লাঠি চালাতে লাগলো। মার খেয়ে মোষটা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাটের

দিকে ফিরলো। ভোম্বোলের বুকটা হালকা হলো। লোকটা পিয়াদা নয়, গাড়োয়ান। গাড়োয়ান না হ'লে মোষটাকে অমন ক'রে ঠ্যাঙায়?

সে আবার পথে উঠে চলতে লাগলো। বাঁশবনের শেষে ক্ষেত; বেশি বড় নয়। তার মধ্যে একটা খাল দেখা যাচ্ছে। খালের ওপারে একখানা গাঁ। গাঁ থেকে ঢোল-কাঁসির আওয়াজ ও সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে, অল্প অল্প।

ভোম্বোল খালের ধারে পৌঁছবার আগেই দেখলো, ও-পার থেকে একখানা ডুলি আসছে। ডুলিখানা শাদা কাপড়ে ঘেরা। ওর মধ্যে নিশ্চয় কোন বউ আছে। পুজো এলো। বউ বোধহয় বাপের বাড়ি যাচ্ছে। পুজোর সময়ে তার খুড়তুতো বোন রাণী-দিদিও বাড়ি আসবে। রাণী-দিদিও পাল্কিতে আসে। অনেক দূর থেকে বেহারাদের 'হুম্ হুম্ হো—ও; হুম্ হুম্ হো--ও' সুর শোনা যায়! আর, সেই সুর শুনে সকলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পালকি এসে বা'র-বাড়ির উঠোনে নামতেই দিদি দরজা খুলে তা'র মধ্য থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে।

রাণী-দিদির ছেলে খোকনটা ভারী দুষ্টু। সকলে বলে—সে ভোম্বোল-মামার মতো দুষ্টু হয়েছে। ভোম্বোল খোকনকে খুব ভালোবাসে। খোকনটা রোজ তা'র কালির দোয়াত উল্টে ফেলবে; ইংরেজী বইখানা তো ছিঁড়ে-কুটে তার একখানা পাতাও আস্ত রাখেনি। বই দেখলেই সেখানা তা'র চাই-ই। বই খুলে পা ছড়িয়ে বসে বলবে—'অ'। রাণী-দিদি বলে,—'কেড়ে নে না—একটা থাপ্পড় মার্ না।'

কিন্তু অতটুকু ছেলেকে কী মারা যায়? খোকনের জন্যে ভোম্বোলের মন কেমন ক'রে উঠলো। সে এসে তাকে এ-ঘর, ও-ঘর নিশ্চয় খুঁজবে। খুঁজুক—ভোম্বোল অনেক দিন পরে তা'র জন্যে অনেক রকমের খেলনা নিয়ে যাবে।

ডুলিখানা 'হুঁ হুঁ' করতে করতে তা'র পাশ দিয়ে চলে গেল।

সরু খাল; অল্প জল। ভোম্বোল স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেল। ও-পারে উঠে কিছুদূর গিয়েই ঢোল-কাঁসি ও সানাইয়ের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেল—ওরা যেন বলছে—'দুম্বা ছাগল ঠ্যাং ঠ্যাং—উঁহু—হুঁ—উ—উ—।'

এখন আবার কী রে বাপু? পুজোর তো এখনও চারদিন বাকী। কিন্তু এ কী? সে যে দক্ষিণ দিকে চলেছে। তা' হোক। রাতখানা ঐখানে কোথাও কাটিয়ে সকালে আবার পশ্চিমের পথ ধরবে।

সে গাঁয়ে ঢুকে খান কয়েক বাড়ি ছাড়িয়েই দেখে সামনে একখানা বাড়ির বাইরের উঠোনে মস্ত সামিয়ানা খাটানো। তার নিচে লোকজন চলা-ফেরা করছে; অনেকে বসেও আছে। আর, তা'র এধারে আমতলায় চাটাইয়ে ব'সে ঢুলিরা বাজাচ্ছে। আর একটু এগোতেই গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার গন্ধ নাকে এলো। ভোম্বোল একজনকে জিগেস্ করলে,—'কী হচ্ছে গো?'

লোকটি সেখান থেকে খেয়ে ফিরছিল। তা'র বাঁহাতে পান ও এক গেলাস পান্তুয়া; ডান হাত এঁটো—বাড়ি গিয়ে ধোবে; পেটটা ভুষির বস্তার মতো। লোকটা বললে,—'রায়মশাইয়ের নাতির অন্নপেরাশন। যাও—যাও—ছেলেরা সব বসেছে—'

ভোম্বোলের খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে সে কী ক'রে খাবে? তবুও সে এক পা এক পা করে এগিয়ে সামিয়ানার তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই তা'র পাশ থেকে কে যেন ব'লে উঠলেন,—'আরে ছোঁড়া! তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? যা—যা—আচ্ছা, চল্ আমার সঙ্গে—'

ভোম্বোল ফিরে দেখে, মোটা-সোটা, ফর্সা, হাসি-হাসি মুখ একজন লোক। তাঁর মাথায় মস্ত টাক—টাকটা চক্‌চক্ করছে—হাতে নতুন ডাবা-হুঁকো, পায়ে বোলে-লাগানো খড়ম। তিনি বললেন,—'ওরে নরহরি! এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দে। অন্নপ্রাশনে ছেলেদেরই পেট ভরে আগে খাওয়াতে হয়। কিন্তু তোমরা তো তা করছো না—'বলতে বলতে তিনি খট্ খট্ ক'রে দু'পা এগিয়ে গেলেন।

নরহরি বললে,—'আজ্ঞে—হাঁ—এই যে—মানে সব এক সঙ্গে ব'সে গেল কিনা, তাই জায়গার একটু টান পড়লো।' চলো খোকা—'বলে নরহরি ভোম্বোলের হাত ধ'রে নিয়ে চললো। যেতে যেতে একটা চাকরকে বললে,—বেটা, শিগ্‌গির যা—কর্তার কলকেয় আগুন নেই—।'

চাকরটা ছুটলো। ভোম্বোলের মনে হলো, উনিই রায়মশাই।

বারো

ভোজ

গায়ে জামা নেই, কাপড় ময়লা, খালি পা, নিমন্ত্রণ-বাড়ির লোকদের মাঝে যেতে ভোম্বোলের বড় লজ্জা করতে লাগলো। সে একবার ভাবলো, 'ফিরে যাই।' কিন্তু নরহরি ততক্ষণে টানতে টানতে তাকে একেবারে খাবার জায়গায় এনেছে। জায়গাটা বাড়ির ভেতরের মস্ত উঠোন। ওপরে লাল সামিয়ানা ; চারধারে বড় বড় টিনের ঘর। ঘরগুলোর দেয়াল মাটির, মেঝে পাকা। ওধারে একখানা দালান। দালানটারই পাশে ভিয়েন হচ্ছে।

খাবারের জায়গার একদিকে ছেলের আর একদিকে বড়র দল। ছেলেরা মহা হট্টগোল বাধিয়েছে। পাকা ফলার। তখন লুচি দেওয়া হচ্ছিল। সকলেই হাত বাড়িয়ে বলছে,—'আমায় আর একখানা।' যে লোকটি লুচি দিচ্ছে, সে লুচির ঝুড়িটা মাথার ওপর তুলে বলছে,—'আগে সব ঠিক হয়ে বোস্। খেতে পারলে একখানার জায়গায় দশখানা পাবি। ভারী তো সব খানেওলা ! কেউ খাবি দেড়খানা ; কেউ খাবি দু'খানা। কেউবা আড়াইখানা খেয়েই কোমরের কষি খুলবি। বোস্—বোস্।'

একেবারে সকলের শেষে তখনও একটু জায়গা ছিল। সেখানে একজন বসতে পারে। দালানটার বারান্দায় কুশাসন, কলার পাতা ও মাটির গেলাস গাদা করা ছিল। নরহরি সেখান থেকে একখানা কুশাসন, খান দুই পাতা ও একটা গেলাস এনে ভোম্বোলের জায়গা করে দিয়ে বললে,—'বোস। তোমার নামটা কী বল তো !'

ভোম্বোল বললে,—'ভুপেন্দ্র নাথ চাকী।'

—'বটে ! বোস।'

ছেলেগুলোর পোশাকের দিকে তাকিয়ে নিজের পোশাকের লজ্জা ভোম্বোলের মন থেকে চলে গেল। সে দেখলো, অর্ধেক ছেলের গায়েই জামা নেই, কাপড় আধময়লা। তাদের চেহারা দেখলেই মনে হয়, বুনো।

ভোম্বোল ব'সে পড়লো। তা'র পাশের ছেলেটা ভোম্বোলের দিকে একবার তাকিয়ে তা'র পাশের ছেলেটার কানে কানে কী যেন বললে। তারপর দুজনেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ভোম্বোল একবার তার সামনে ও পাশের ছেলে দুটোর দিকে তাকালো। তারপর তাদের দিকে আর মনোযোগ দিলে না। কেননা তখন লুচি, শাকভাজা, বেগুনভাজা ও কুমড়োর ছোঁকা পাতে পড়ে গেছে ;—মুড়িঘণ্ট আসে আসে, তার নাম শোনা যাচ্ছে।

ভোম্বোলের তখন খুব ক্ষিদে থাকলেও ঠিক করলো ওসব বাজে খাবার খেয়ে পেট ভরাবে না। একেবারে শেষের দিকে চালাবে। সে মাত্র খান দুই লুচি খেলো, মাছটাও বাদ দিলে না। রুই মাছ, রান্নাটাও হয়েছে মাংসের মতো। মাছটাও টাট্‌কা। রায়মশাইয়ের শীতলপুর মৌজা থেকে এসেছে। মাছের পরই এলো চাট্‌নি ; তারপরই দই। ভোম্বোল দই তেমন ভালবাসে না। দই খেতে খেতেই এলো বোঁদে।

ভোম্বোলের পাশের ছেলেটা কোমরের কষি খুলে দিলে। তা'র সামনের সারির একটা ছোট ছেলে উঠে দাঁড়াতেই তার কোমর থেকে কাপড় খুলে গেল। ছেলেটার পেট গণেশের পেটের মতো ফুলে উঠেছে ! সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাত চাট্‌তে লাগলো। বোধহয় ওর বাবাকে খুঁজছে ; বলবে,—'আর খেতে পারছি নে।'

বোকা ! একদম বোকা ! নিমন্ত্রণ খাওয়ার মজা তো চাট্‌নির পর থেকেই। ভোম্বোলের পাতে এক খাব্‌লা বোঁদে পড়লো। বোঁদেগুলো যেন এক একটা রসেভরা আঙুর। বোঁদেওলার পিছু পিছু আস্‌ছে ক্ষীরের হাঁড়ি। এইবার মজা ! ছেলেরা হৈ-হৈ করে উঠলো,—'ক্ষীর—ক্ষীর।' হাঁড়িটার মাথায় মাথায় ক্ষীর।

ভোম্বোল বসেছিল একেবারে একধারে—সেদিক থেকে ফার্য়স্‌টা। তা'র পাত থেকেই দেওয়া শুরু হলো। জমাট ক্ষীর, লাল রং, মিষ্টি গন্ধ। লোকটি খুরি দিয়ে ক্ষীরের মাথা ভাঙতে ভাঙতে ভোম্বোলের

দিকে একবার তাকালো। সে ভোম্বোলকে চেনে না। তবু ভরা খুরিটার সব ক্ষীর ভোম্বোলের পাতে ঝাঁকি দিয়ে ঢেলে দিলে। ভোম্বোল ক্ষীর-বোঁদে একসঙ্গে মেখে খেতে লাগলো। দেখতে দেখতে পাত খালি। ক্ষীরের হাঁড়ি আবার এলো, কিন্তু বোঁদের থালা নেই। না থাক্, সে লুচি দিয়েই ক্ষীর খেতে লাগলো। ক্ষীরওলা তার খাওয়া দেখে বললে,—'বাঃ ভাই! আর দেবো?'

ভোম্বোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললে,—'দিন।'

কিন্তু হাঁড়ি তখন খালি। লোকটা খুরি দিয়ে হাঁড়ির গা ও তলা চাঁছলো। তাতে যা উঠলো, সামান্য তাই ভোম্বোলের পাতে দিতে দিতে বললে,—'আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।' কিন্তু তারপর কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা এসে গেল, সে ফিরে এলো না। যখন এলো, হাতে পান্তুয়ার হাঁড়ি।

ভোম্বোল পান্তুয়া খুব ভালবাসে। পান্তুয়াগুলো নাকি এসেছে মোল্লারহাট থেকে। লোকটি একসঙ্গে চারটে পান্তুয়া ভোম্বোলের পাতে দিয়ে বললে,—খাও, ভাই।' পান্তুয়াগুলো বেশ বড় বড় আর ক্ষীরে ভরা। তার ভেতরে দুটি-একটি এলাচদানা। খাবার সময় দাঁতের মাঝে পড়ে পুট্ ক'রে ভেঙে ক্ষীরের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে রায়-মশাই তামাক টানতে টানতে সেদিকে এলেন। আসতে আসতে সকলকে জিগ্যেস করছেন,—'তোর কী চাই রে?···· তুই খাচ্ছিস নে কেন? ··এই, তোর পেট ভরেছে?' বলতে বলতে তিনি ভোম্বোলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভোম্বোল তখন শেষ পান্তুয়াটি মুখে পুরেছে; তার গাল দুটো ফুলে উঠেছে।

রায়মশাই বললেন,—'এই ছেলেটি তো বেশ খায়। এই দ্বিজপদ, ওহে শুনছো? হাঁড়ি নিয়ে এদিকে এস।'

দ্বিজপদ রায়মশাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াতেই রায়মশাই ভোম্বোলকে দেখিয়ে বললেন, —'দাও ঐ পাতে।'

লোকটি হাঁড়ি থেকে একজোড়া পান্তুয়া তুলে ভোম্বোলের পাতে দিলে। দেখতে দেখতে সে দুটো উড়ে গেল।

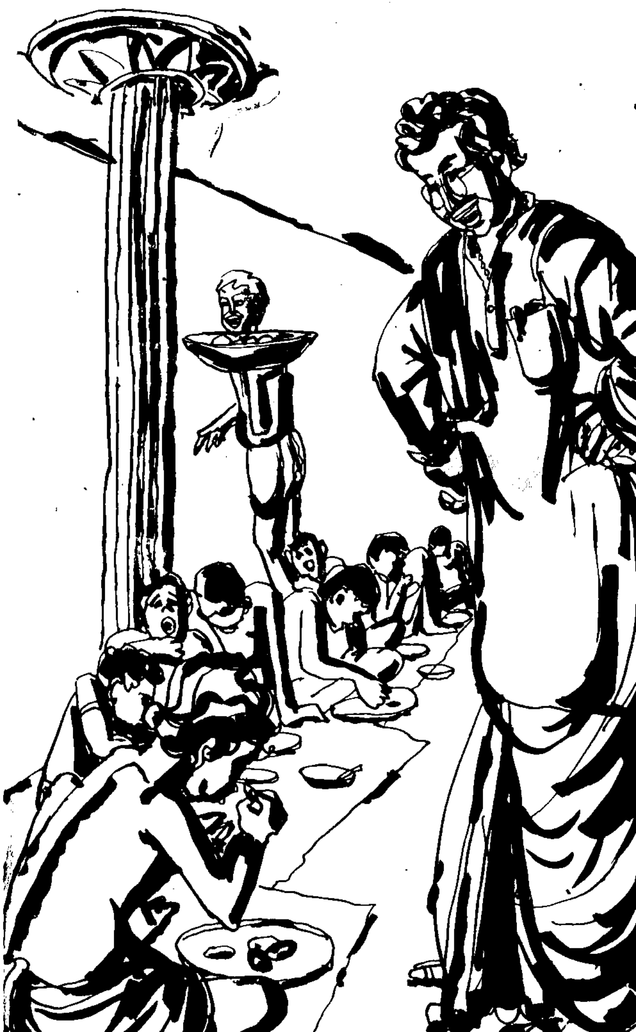

রায়মশাই হাসলেন। দ্বিজপদকে বললেন,—'তোমার কম্ম নয়।' বলে নিজেই হাঁড়ি থেকে গোটা ছয়েক পান্তুয়া তুলে ভোম্বোলের পাতে দিয়ে বললেন,—'পেট ভরে খা। তোরা, ছেলেরা, খুশি হ'লে আমার নবদাদুর কল্যাণ হবে।' বলতে বলতে তিনি খট্ খট্ করে এগিয়ে গেলেন।

ভোম্বোল পান্তুয়াগুলো খেয়ে, জলের গেলাসটি এক নিঃশ্বাসে খালি ক'রে দিলে। তারপর পান নিয়ে সকলের সঙ্গে খিড়কির পুকুরে গেল হাত ধুতে।

পুকুরে হাত ধুতে ধুতে শুনলো, সন্ধ্যায় শশী বাগ্‌দীর যাত্রা হ'বে। সকালে তিন গরুর গাড়ি বাক্স-সিন্দুক ভরা সাজ-পোশাক এসেছে। পালা হ'বে, 'কংসবধ'। দুপুরেই হ'তো; যাত্রা-পার্টির খাওয়া হয় নি, তাই সময় বদলে গেছে।

যাত্রার নাম শুনে ভোম্বোলের বড় আনন্দ হলো। কংসবধ পালাটা ভাল; যুদ্ধ আছে। 'ম্যাড্‌গিনও' যেন একটা আছে। সে যুদ্ধের বাজনাটা একবার মনে মনে আউড়ে নিলে,—'ঘাজা ঘাঁই---ধপড় ধপড়্—ঘাজা ঘাঁই।'

পল্লীগ্রামের ভোজ, বসতে দুপুর গড়ায়, উঠতে সন্ধ্যা। যাত্রার আর কতই বা দেরি? সন্ধ্যা তো লাগলো ব'লে। দিনের আলো নিভে যাচ্ছে; গাছের তলা অন্ধকার হয়ে আসছে। সে পুকুর-পাড় ঘুরে, ধানের গোলার পাশ দিয়ে, বার বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় দেখলো, গোয়ালের ওধারে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তা'র একপাশ জুড়ে একসার ছেলে-বুড়ো খাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ উবু হয়ে বসেছে। ওরাই বোধহয় যাত্রার লোক। অনেকে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখছে। স্বয়ং রায়মশাই তদারক করছেন।

কিন্তু ভোম্বোল বা'র-বাড়িতে এসে দেখে কোথায় কী? যাত্রাগানের কোন লক্ষণই নেই। কেবল সামিয়ানার তলায় খানিকটা জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘেরা। হয়তো ঐটেই আসর হবে। সে সামিয়ানার বাইরে

এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। একবার সাজ-ঘরের দিকে গেল। সেখানে খুব ভীড়। কত ছেলে-বুড়ো দাঁড়িয়ে দেখছে, হট্টগোল করছে। ঐ যে তীর-ধনুক, তলোয়ার, অয়েলক্লথমোড়া গদা, টিনের বল্লম দেখা যাচ্ছে।

সেখান থেকে সরে এসে ভোম্বোল এ-ধার, ও-ধার ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলো, কয়েকটা ছেলে কলাপাতার বাঁশি তৈরি করে বাজাচ্ছে—'ফুঁক্কু ফুক্কু ফুঁ---উ---উ–।'

হঠাৎ তাদের মধ্যে দুটো ছেলের কলার পাতা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। প্রথমে জোর কথা কাটাকাটি। তাই থেকে হাতাহাতি শুরু হলো। দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। পড়েই গড়াগড়ি দিতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে দু'জনেই এ ওর বুকের ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।

অন্য ছেলেরা তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে দেওয়া দূরের কথা চারধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে! কেউ কেউ আবার বলছে,---'নারদ---নারদ খ্যাংরাকাঠি, লেগে যা নারদ ঝটাপটি!'

ভোম্বোল ছুটে গিয়ে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিলে, আর, অমনি ও-দিক থেকে ঢোলক বেজে উঠলো,—'গদা ঘাঁই---ধপড়্---ধপড়্---গদা ঘাঁই---।' সকলে দুড়, দুড় করে সেদিকে ছুটলো। যাত্রা বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

ভোম্বোল গিয়ে দেখলো, যাত্রা তখনও আরম্ভ হয়নি, কেবল আসর বসেছে। চারধারে গোলমাল, হুড়োহুড়ি। সকলেই আগে বসতে চায়। ঘেরা জায়গাটার বাইরে ছেলেরা কেউ কেউ বসে গেছে।

একজন ফর্সাগোছের বাবু, গায়ে সিল্‌কের পাঞ্জাবী, মাথায় লম্বা টেড়ি, মুখে সিগ্‌রেট, আঙুলে আংটি, হাতে ছড়ি, বড়দের বলছেন,---'এই, ছেলেদের আগে বসতে দাও।'

ভোম্বোল তাদের মাঝ দিয়ে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বস্‌লো। তারপর একটু একটু করে এগোতে এগোতে একেবারে বেড়ার ধারে হাজির। যাত্রার বাজিয়েরা তখন হারমোনিয়াম, বেহালা, ঢোলক, বাঁয়া-তবলা নিয়ে টুং টুং, পোঁ পোঁ, ঠক্ ঠক্ করছে। কেউ কেউ তামাক খাচ্ছে,

বিড়ি ফুঁকছে। বাজিয়েদের তোড়জোড়ের আর শেষ নেই। কখন শুরু হবে রে? বেজায় গরম লাগছে রে!

হঠাৎ কন্‌সার্‌ট বেজে উঠলো। ঢোলকের বোলগুলো যেন বুকের মধ্যে গিয়ে ঘা মারতে লাগলো---ধুদ্ ধাক্, ধুদ্ ধাক্, ধপড়্ ধপড়্!

তেরো

যাত্রা

কন্‌সার্‌ট পুরোদমে বেজেই চলেছে। ঢোলক-বাজনদার ঢোলকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ঢোলক থাব্‌ড়াতে তা'র চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা আর বাজাতে পারছে না, হাত দুখানা ভাঙো-ভাঙো। শ্রোতারাও সকলে বিরক্ত হয়ে উঠলো। প্রথমে বেশ চুপচাপ ছিল। কন্‌সার্‌টের ঠেলায় সকলে হট্টগোল শুরু করে দিলে। তার ওপর ভ্যাপ্‌সা গরম ও বিড়ি-সিগরেটের ধোঁয়ায় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হঠাৎ কন্‌সার্‌ট থেমে গেল।

চারধারে চাপা গোলমাল। এইবার বোধ হয়, 'প্লেয়াররা' আসবে। ভোম্বোল 'পেয়াররা' আসবার পথের ভিড়ের দিকে তাকায়, যদি রাজার মুকুটের পালখ, কী, তপস্বীর দাড়ি ও জটা দেখা যায়। একটা ছেলে বললে,—'ঐ যে নারদ আস্‌ছে।'

ছেলেরা সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। একজন জিগ্যেস করলে,—'কৈ রে?'

—'ঐ যে শাদা দাড়ি! 'মাথায় পাকাচুলের চুড়ো—'

—'যাঃ! ও তো নিতাইয়ের পিসে—উদ্ধব হালাদার।'

ছেলেরা খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর 'এই আসে, এই আসে' ক'রে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আসরের দক্ষিণ দিকে ফরাস ও বেঞ্চির ওপর গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা বসেছেন। এবার শাদা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে রায়মশাই এসে তাদের মধ্যে বসলেন। আবার হুংকার দিয়ে কন্‌সারট বেজে উঠলো। ভোম্বোলের বাঁ ধারে কয়েকটা ধাড়ি ছেলে বসেছিল। তাদের একজন বললে,—'এইবার শুরু হ'বে।'

আর একজন জিগ্যেস করলে,—'কী করে বুঝলি?'

—'রায়মশাই এসে বসলেন যে।'

তা'র কথাই ঠিক হ'লো। এবার কন্‌সার্‌ট আর বেশিক্ষণ বাজলো না। থামতে না থামতেই ভিড়ের মাঝ থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে এলো। 'প্লেয়াররা'—নারদ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী আরও যেন কে—বোধহয় দৌবারিক।

তাদের দেখে গোলমাল আরও বেড়ে উঠলো। অধিকারী শশী বাগ্‌দী বসেছিল বেড়ার মধ্যে ভোম্বোলের সামনে। সে পাশের একজনকে বললে,—'চিয়ার চেয়ে নাও, বিষ্ণু বসবে।'

লোকটা গুঁড়ি মেরে হাত কয়েক এগিয়ে গেল। তারপর তিন হাত-পায়ে ভর দিয়ে ডান হাতখানা তুলে রায়মশাইয়ের সামনে দু-আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে বললে,—'কর্তা, চিয়ার—'

অমনি একজন বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠলো,—'চেয়ার—এই, একখানা চেয়ার—বিষ্টু বসবে—'।

অধিকারী বললে,—'আর লক্ষ্মী কী দাঁড়িয়ে থাকবে, বাবু?'

—'ওহে, দু'খানা—দু'খানা চেয়ার।'

সকলের মাথার ওপর দিয়ে হাতে হাতে দুখানা চেয়ার চলে এলো। একখানার বসবার জায়গায় ছিল বেতের ছাউনী। বিষ্ণু ও লক্ষ্মী বসলো। সঙ্গে সঙ্গে নারদ অ্যাকটিং আরম্ভ করলো। কিন্তু চারধারে গোলমালে কিছুই শোনা যায় না। কেবল দেখা যায়—নারদের একখানা হাত ও দাড়ি নড়ছে।

সেই বাজখাঁই গলাটি চীৎকার ক'রে উঠলো,—'চুপ্‌—চুপ্‌—বড় গোল হচ্ছে—'

অমনি চারধার থেকে চীৎকার আরম্ভ হলো,—'চুপ্‌—চুপ্‌—বড় গোল হচ্ছে—।'

মিনিট দুই ধরে ধমকা-ধমকির পর গোলমাল থামলো। তবু নারদের গলা শোনা যায় না, কেবল দাড়ি নড়ে। গলাটা একেবারে বসে গেছে। সে ধরা গলায় বিষ্ণুকে বললে,—'প্রভো—'

একজন শ্রোতা সেই কোণের দিক থেকে বলে উঠলো,—'জোরে।' 'আর একজন এই কোণ থেকে বললে,—'লাউডার, প্লীজ্‌।'

অধিকারী বিরক্তির সঙ্গে নারদকে বললে,—'বেটাকে বারণ করলেম, দই খাস্ নে। তোর গলা ধরে গেছে। এখন সাঁ—সাঁ করছে—'

লক্ষ্মী বসেছিল বেতের ছাউনি দেওয়া চেয়ারে। সে মিনিট দুই বসেই উস্‌খুস্ করতে লাগলো। একবার এক্ষখানা পা একটু চুলকে ফেললো। ভোম্বোল বুঝলো, লক্ষ্মীকে ছারপোকা কামড়াচ্ছে। তখন নারদ পুরোদমে অ্যাকটিং করছে। লক্ষ্মীর স্থির হয়ে বসে থাকা দায় হলো। ছারপোকাগুলো কতকাল যে মানুষের রক্ত খায়নি। লক্ষ্মী বিষ্ণুর দিকে হেলে বললে,—'ছারপোকার কামড়ে পা দুখানা কাঁঠালের মতো হয়ে উঠলো যে। আর বসতে পারছি নে।'

বিষ্ণু বললে,—'উহুঁ হুঁ—বোসে থাক্।'

ভোম্বোল বসেছিল তাদের কাছেই। দু'জনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বললেও তা'র কানে আসছিল সব। লক্ষ্মী বললে,—'তুই বসে দেখ্ না, ঠেলা কেমন!'

—'তবে উঠে দাঁড়া।'

বিষ্ণু আর বলতে পারলো না; এবার তার 'অ্যাকটিং'। লক্ষ্মী মুখ কুঁচ্‌কে কোন রকমে ব'সে রইলো। সে মাঝে মাঝে বিড় বিড় ক'রে কী বলছে। ভোম্বোলের ভারি মজা লাগছে। শেষে তার 'অ্যাকটিংয়ের পালা এলো। সে ব'সে ব'সেই দু'চার কথা বলে চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সকলে চলে গেল।

এবার আর এক 'সিন'। 'প্লেয়ারদের' আসা-যাওয়ার পথের দিকে ভোম্বোল তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ভীড়ের একধারে ভয়ানক ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। চটাচট্ চড়-চাপড় চলছে। ভোম্বোল শুনলো' হাঁটের লোকেরা ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে আট-দশজন গোয়ালা আছে। বসার জায়গা নিয়ে বাঁক হাতে ক্ষেপে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রায়মশাইয়ের বাড়ি বলেই রক্ষা। বারোয়ারিতলা হ'লে এতক্ষণে সামিয়ানার আগুন ধ'রে যেতো। রায়মশাইয়ের লোকজনেরা সকলকে থামিয়ে দিলে।

সব চুপ্‌চাপ্, অ্যাকটিং শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালাটা বেশ জমে উঠলো।

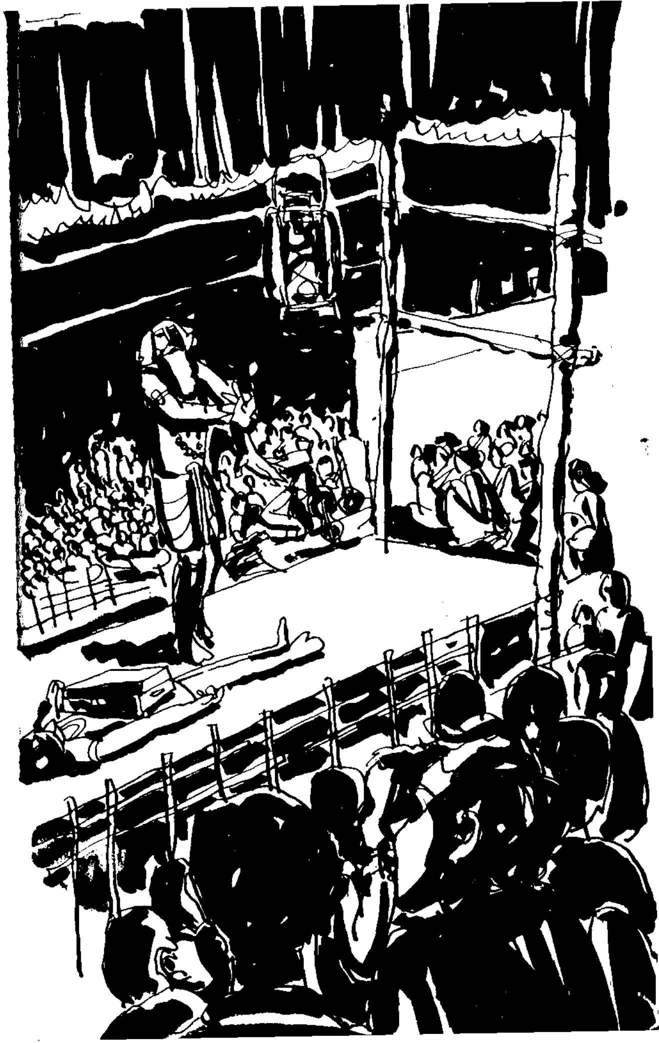

একটা 'সিন' এলো—'রাজা কংসের কারাগার'। দেবকী ও বসুদেব বন্দী হয়ে পড়ে আছেন। তাঁদের বুকে মস্ত মস্ত দুখানা কালো পাথর চাপানো! তাঁরা শুয়ে শুয়েই অ্যাকটিং করছেন। গলা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। দু'জনকে দেখবার জন্যে ভোম্বোল ও আরও অনেকে হাঁটু গেড়ে বসে সারসের মতো গলা লম্বা করে দিলে। অমনি পিছনে যারা বসেছিল, তারা চীৎকার করে উঠলো,—'বোসে পড়ো—বোসে পড়ো—ও!' কিন্তু কে কা'র কথা শোনে? ঐ যে দেবকী আর বসুদেব শুয়ে। তাঁদের বুকে কালো পাথর। ভাগ্যে ও দুটো সত্যিকারের পাথর নয়, বেহালার বাক্স। দেবকী আর বসুদেবের যা চেহারা। সত্যিকারের পাথর হ'লে, দুটিতে এতক্ষণে চিঁড়ের মতো চেপ্টে পড়ে থাকতেন। কংসের ওপর ভোম্বোলের খুব রাগ হলো। কী শয়তান! কত ছেলেকে মেরে ফেলেছিল!

অধিকারী তামাক টানতে টানতে পাশের লোকটার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললে,—'ও গণেশ, জুড়ী তোল—'

গণেশের ইসারায় হঠাৎ বেজে উঠলো, 'কন্সার্ট'; আর চারধার থেকে উকিল-মোক্তারের মতো চোগা-চাপকান পরা জুড়ীর দল সরু-মোটা স্বরে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়ালো। তাদের পিছু পিছু উঠলো একপাল কালো কালো, রোগা রোগা ছোঁড়া। ছোঁড়াগুলোর মাথায় কালো পাথরের খোরার মতো জরিদার টুপি, গায়ে সলমা-চুমকি বসানো, লাল-কালো সাটিনের ঢিলে জামা। জামাগুলোর হাতা লম্বা, আঙুল ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো লম্বা হাতা ঝুলিয়ে গাইতে লাগলো—'ওরে রাজা কংস,

হবি রে নির্বংশ।
তোর যে কৃতান্ত,
জন্মিল ধরায়—এ—এ—এ—।

গায়কদলের মাঝে চোগা-চাপকান-পরা দু'জন বেহালাদার—লম্বা, রোগা, একমুখ গোঁফ, যেন দুই পেশকার দাঁড়িয়ে বেহালার ওপর ঘাড় কাৎ ক'রে চোখ বুজে ছড় টানছে। বেহালা বাজছে—'ক্যাঁ-কোঁ, কোঁ-কোঁ, কংক; কোঁ-কোঁ, কোঁ-কোঁ—কংক—হুঁস্—'

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে উঠলো—'ঝড় আসছে—ঝড় আসছে—সামাল-সামাল—।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড সামিয়ানাখানা জ্বলন্ত বাতিগুলো সমেত দড়ি-টানা ছিঁড়ে আকাশে উড়ে যাবার মতো হলো। আলোগুলোর শিখা চিমনির মধ্যে প্রচুর ভুষো ছেড়ে নেচে উঠলো। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকালো ; মেঘ ডাকলো, কড়্ কড়্, কড়াৎ, যেন আকাশের দরজা খুলে ফেল্‌লো।

ঐ এলো—ঐ এলো। ঠাণ্ডা বাতাসের একটা দমকা এসে গায়ে লাগলো। সেই ভ্যাপ্‌সা গরমে ভোম্বোলের ভারি আরাম বোধ হলো।

দেখতে দেখতে যাত্রার আসর ফাঁকা। সামিয়ানা হুম্ হাম্ শব্দে লাফাচ্ছে, আলোগুলো গেছে নিভে। নামলো বৃষ্টি। ভোম্বোল ততক্ষণে রায়মশাইয়ের কাছারি-ঘরের বারান্দায় উঠে পড়েছে।

রাতে সে ফরাসের একধারে একটু শোবার জায়গা পেল। ঘুমও হলো বেশ।

চৌদ্দ

পদ্মদিদির শ্বশুরবাড়ি

পরদিন—

তখন ঘরের চালে কাক ডাকছে, অনেকে ফরাসের ওপর উঠে বসেছে। কেউ কেউ শুয়ে শুয়েই হাই তুল্‌তে তুল্‌তে মুখে তুড়ি দিচ্ছে। ভোম্বোল উঠে বসলো।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখে, সব পরিষ্কার, কিন্তু ভিজে ভিজে। সারা আকাশে কোদাল কোদাল মেঘ, যেন মাটি ফেলা। সে বেরিয়ে পড়লো।

আগের দিন যে পথে এসেছিল আজও সে পথ ধ'রে ফিরে চললো। গাঁয়ের শেষে পোঁছেই এক চাষীর সঙ্গে তা'র দেখা। ভোম্বোল তাকে জিগ্যেস করলে :—'এ পথ দিয়ে রেল-রাস্তায় যাওয়া যাবে?'

চাষী বললে,—'রেলগাড়ি? ঐদিকে রেলের গাড়ি কোথায়?'

—'তবে কোথায়?'

—সেই শালুকডাঙা। 'ইদিকে রেল-টেল চলে না।'

—'তবে কাল আমায় যে একজন বললে, এইদিকে রেল-রাস্তা আছে!'

—'ইদিকে? হাঁ—হাঁ। তা' সে কান্তিনগরের ওধার দিয়ে। তুমি যাবো কোথা?

—'রেলরাস্তা—'

—'সেখানে কী আছে? সেই রেলের গাড়িতে চাপবো নাকি?'

ভোম্বোল বললে,—'হুঁ।'

—'সিদিক দিয়ে তো কেবল মালের গাড়ি চলে। তুমি মালের গাড়ি চাপবা?' তারপর বললে,—'ছোঁড়াটা কল্মা!'

ভোম্বোল চুপ ক'রে রইলো।

লোকটা বললে,—'কা'র ছাওয়াল তুই? রায়মশাইয়ের বাড়ি এয়েছিলি বুঝি? যা, ঘরে যা। কুটুমবাড়ি এয়েও কল্লামী? যা—'

ভোম্বোল দেখলো গতিক ভাল নয়। না গেলে হয়তো চাষার মার খেতে হবে। সে গাঁয়ে ফিরে গেল। তারপর গাঁয়ের ও-ধারে গিয়ে দেখে, একটা পাকা সড়ক দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো চ'লে গেছে, যেন একটি উঁচু বাঁধ। ওর সে-ই শেষে একখানা গাঁ দেখা যায়, নীল ধোঁয়ার মতো। ওরই নাম বোধহয় কান্তিনগর। সড়ক ধরে তখন সার বেঁধে খান চারেক গরুর গাড়ি চলেছিল। গাড়িগুলো পাট বোঝাই।

একখানা গাড়ির গাঁঠের ওপর জন দুই লোক বসে 'আছে। তাদের একজন কানে হাত দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরেছে—'সু—উখের কথা—আ—আ—র বোলো—না—আ—আ—'!

ভোম্বোল গাড়িগুলোর পিছন পিছন চললো। সেও যদি একখানা গাড়ির গাঁঠের মাথায় চ'ড়ে ব'সতে পারতো! কিন্তু গাড়িগুলো আধ-ক্রোশটাক পথ ভেঙেই পূবের সড়ক ধরলো। ওদিকে কোন্ গাঁ কে জানে!

ভোম্বোল সেই আগের সড়ক ধ'রে চলতে লাগলো। ক্রোশ দেড়েক পরেই আবার এক খাল। খালটা গভীর ও কিছু চওড়া। তার ও-পারে গাঁ, বেশি দূর নয়।

খালের কোলে কোলে কাশ ফুল ফুটেছে, বাতাসে নুয়ে পড়ছে। তারপর বিশাল ধানক্ষেত। তিনটে মোষ-খালের জলে গা ডুবিয়ে কেবল মাথা বা'র ক'রে চোখ বুজে যেন মহা আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ছে—ফোঁস্—ফোঁস। তার এধারে রাখাল ছেলেরা হৈ চৈ করতে করতে স্নান করছে, সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ পরণের কাপড়খানা খুলে তাই দিয়ে মাছ ধরছে। আর একটু এধারে বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর নিচে জল কম। চাষী-বউরা জলে গা ডুবিয়ে বসে গা রগ্ড়াচ্ছে, কেউ কেউ চোখ বুজে সোডা দিয়ে মাথা ঘষছে। কেউ বা একরাশ ছেঁড়া, ময়লা কাপড় নিয়ে কূলে বসে কাচছে, আর উঁচু গলায় ঘর-সংসারের গল্প করছে। সাঁকোর বাঁশের মাথায় একটা মাছরাঙা পাখি ব'সে আছে। তা'র কোনদিকে চোখ নেই; ভয়ানক গম্ভীর! বোধহয় মনে মনে একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করছে। হঠাৎ সে সোজা ঝপ্ ক'রে খালের জলে প'ড়েই একটা ছোট মাছকে ঠোঁটে চেপে ধরে আবার উড়ে এসে বাঁশের মাথায় বসলো। তারপর মাছটাকে গিলে ফেলে আগের মতোই চিন্তিত হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভোম্বোল সাঁকোয় উঠে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। লম্বা খাল—পূব-পশ্চিমে বেঁকে গেছে। জলে স্রোত আছে। দু'ধারে ক্ষেত। একজায়গায় বেশ বড় গোছের একটা দোয়াড় পাতা। তা'র বেড়া ঠেলে কুল কুল ক'রে জল বেরিয়ে আসছে। ঐ খরা জাল দেখা যায়। জালখানা উঠলো;—ওর গায়ে কতকগুলো ছোট ছোট মাছ ধড়ফড় করছে, যেন রূপোর টুক্রো। মাছগুলো বোধহয়, খয়রা।

গাঁয়ের দিক থেকে একটা লোক ছুট্তে ছুট্তে আসছেন। তা'র ছোটার তালে তালে শব্দ হচ্ছে—ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুমুর-ঝুমুর। কাছাকাছি এলে ভোম্বোল দেখলো, লোকটা 'রাণার'। পিঠে তা'র ডাকের থলি, কোমরে চাপরাশ, চাপরাশের মাঝখানে পেতলের তক্তিতে বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে কী লেখা, হাতে সে ধরে আছে ভোঁতা বল্লম। বল্লমের পিছনে ডাকের থলি গলায় একজোড়া ঘুণ্টি বাঁধা। 'গভরণমেনটের' ডাক যাচ্ছে। ওকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। ওরা নাকি গণ্ডারের মতো সোজা চলে। পথ না ছাড়লে পেটে সোজা বল্লম চালিয়ে দেয়! ভোম্বোল তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হ'য়ে নেমে দাঁড়ালো।

লোকটা একেবারে কাছে আসতেই তা'র সঙ্গে ভোম্বোলের কথা বলতে ইচ্ছে হ'লো। ভোম্বোল দেখাতে চায়, সে 'রাণারদের' বিষয় সব জানে; তা'দের দেখে একটুও ভয় পায় না। সে 'রাণারকে' জিগ্যেস করলে,—'এ গাঁয়ের নাম কী গো?' 'কান্তিনগর?'

লোকটির বুকের ছাতিখানা বেশ চওড়া। সারা গা ঘামে ভিজে। সে বুকখানা আর একটু চিতিয়ে সাঁকোয় উঠ্তে উঠ্তে গম্ভীর মুখে বললে,—'চিটেঝুড়ি।'

—'চিটেঝুড়ি? সে কী! তবে কান্তিনগর কদ্দুর? কান্তিনগর কোথায়?'

লোকটি তখন এগিয়ে গেছে। তবু জবাব দিলে,—'ইয়ের পর।' ব'লেই তর্ তর্ ক'রে সাঁকো পার হ'তে লাগলো। ওপারে গিয়ে সড়ক ধ'রে আবার ছুট দিলে—ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুমুর-ঝুমুর। শব্দটা ধানক্ষেতে ছড়িয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকতে ঢুকতে একবার পিছন ফিরে দেখলো। লোকটি সড়ক ধ'রে অ—নে—ক দূরে চলে গেছে। আর তা'কে দেখা যায় না!

গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই আমতলায় এক গৃহস্থ-বাড়ি। তা'র বাঁ'র দিককার ঘরের ছেঁচ থেকে একখানা পুরনো সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে বাঙলায় লেখা—'চিটেঝুড়ি পোষ্ট আফিস্।' না—লোকটি ঠিকই বলেছে। হঠাৎ ভোম্বোলের মনে হলো, নামটা যেন চেনা। কিন্তু চিটেঝুড়ি কী? ভোম্বোল ঠিক মনে করতে পারছে না। তবু মনে হচ্ছে নামটা সে শুনেছে। রোদে হেঁটে এসে তা'র গলা শুকিয়ে গেছে। কোথাও যদি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল—

ভোম্বোল পোস্ট অফিসের উঁচু পাকা বারান্দায় উঠে ছোট জানলাটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো। ঘরে কেউ নেই। খাতাপত্র, ময়দার কাই ও তামাকের গন্ধ একসঙ্গে মিশে জানলা দিয়ে এসে ভক্ ক'রে তা'র নাকে লাগলো। সেখান থেকে সরে এসে সে একটু এদিক-ওদিক ক'রে পথে নেমে আবার এগিয়ে চললো। খান পাঁচ-ছয় বাড়ি ছাড়িয়েই দেখলো বাঁ ধারে একটা পুকুরের এক কোণা। পুকুরটা একখানা বাড়ির পিছন দিকে। রাস্তা থেকে একটা সরু পায়ে-চলা পথ গেছে সেদিকে। পথটা বোধহয় পাড়ার বউ-ঝিদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে। ভোম্বোল জল খাবার জন্যে সে পথে পুকুরের দিকে চললো।

ঝোপ-জঙ্গল ও কচুবনের মাঝ দিয়ে পুকুর-ধারে গিয়ে দেখে, ডানদিকে পরিষ্কার বাঁধানো ঘাট। পুকুরের চারধারে নারকোল গাছ। একটি বউ তখন ঘাটের পৈঠা দিয়ে নিচে নামছে। ভোম্বোল গিয়ে ঘাটের ওপর দাঁড়ালো।

বউটির মাথায় ঘোমটা; পরণে টক-টকে লাল পাড় শাড়ি, কাঁধে একখানা লাল রঙের গামছা। জলে নামবার আগে মাথার ঘোমটা খুলে সে একবার পিছনে ঘাটের ওপর তাকাতেই ভোম্বোল চমকে উঠলো—

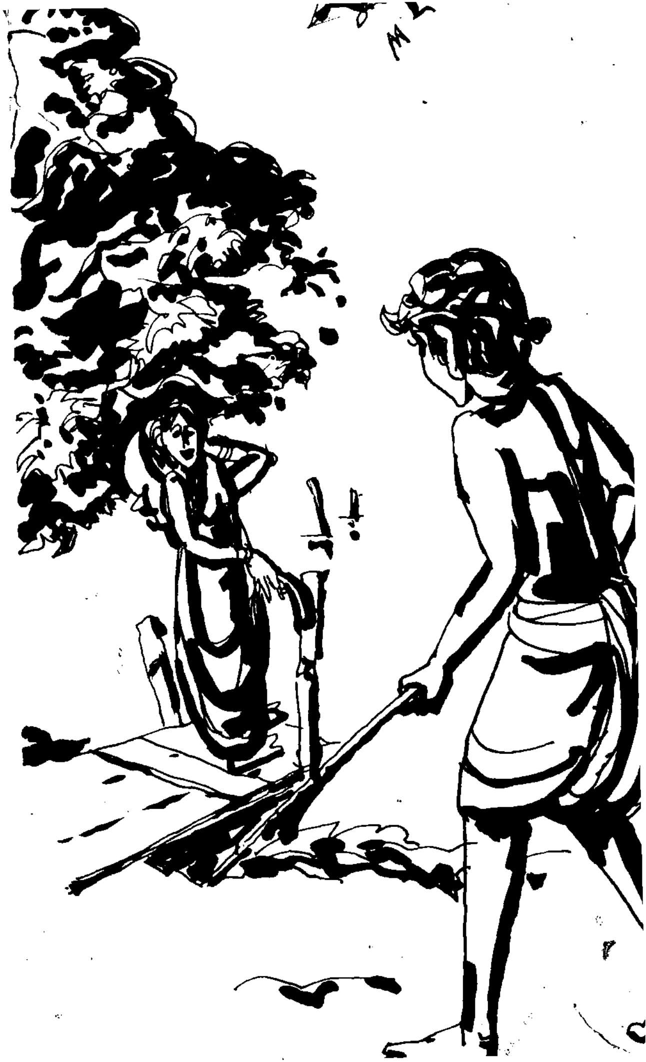

পদ্মদিদি! বউটিও অবাক! ডাগর চোখ দুটো কপালে তুলে বললে,—'ভোম্বোল? তুই এই বেশে এখানে?'

পদ্মদিদি নিধু চক্রবর্তী মশাইয়ের বড় মেয়ে; তা'র রাণীদিদির বন্ধু। দুটিতে ভারী, ভাব। চিটেঝুড়ি গাঁয়ে পদ্মদিদির শ্বশুরবাড়ি। এতক্ষণে ভোম্বোল গাঁখানা চিনতে পারলো। বললে,—'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস্?' বলতে বলতে পদ্ম পৈঠা বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলো। তারপর বললে,—'গায়ে জামা নেই, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, মাথার চুল রুক্ষু। একী চেহারা? এই বেশে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? বাড়ি থেকে পালিয়েছিস্ বুঝি?'

ভোম্বোল চুপ্ করে রইলো। পদ্মদিদি তার হাত চেপে ধ'রে বললে,—'চল্, ভেতরে চল্।'

ভোম্বোল তেমনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পদ্মদিদি বললে,—'লক্ষ্মী ভাইটি। চল্ ভেতরে—

ভোম্বোলের চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। সে কান্নাটা গিলে ফেলে বললে,—'আমি কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যাবো না।'

—'কোথায় যাবি?'

—'টাটানগর।'

—'টাটানগর? সেখানে কী—বেশ, তাই-ই যাস্। আজকের দিনটা দিদির বাড়ি থেকে যা—' বলে পদ্মদিদি ভোম্বোলকে টেনে নিয়ে চল্লো। ভোম্বোল চলতে লাগলো খুব অনিচ্ছায়।

ভেতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওধার থেকে কে এক বুড়ী জিগ্যেস করলেন,—'ও বউমা, কাকে টানতে টানতে আনছো?'

পদ্মদিদি উত্তর দিলে,—'হারাণকাকাকে জানেন তো?'

—'তা আর জানবো না?'

—'এ তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে।'

—'ও! সেই রাণীর ভাই?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা', অমন কেনো—'

পদ্মদিদি ভোম্বোলের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে চোখ টিপলো। ভোম্বোল বুঝতে পারলো, উনি পদ্মদিদির শাশুড়ী। বুড়ী পদ্মদিদির মুখের দিকে তাকিয়েই যেন অন্যমানুষ হয়ে গেলেন। বললেন,—'তা' বেশ—তা' বেশ। ভাত তো হয়ে গেছে। পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছে দুটো খেয়ে নিক্'—বলে বুড়ী একখানা ছোট খড়ের ঘরের বারান্দায় উঠে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ওখানা বোধহয় হবিষ্যির ঘর।

ভোম্বোল নেয়ে এসে কাপড় বদলে পেটভরে খেলো। দুপুরে মাদুর পেতে পা ছড়িয়ে বসে, রোদে চুল এলিয়ে পদ্মদিদি ভোম্বোলের কাছ থেকে চক্রবর্তীবাড়ির অনেক খবর নিতে লাগলো; তারপর এক সময়ে জিগ্যেস করলে,—'তুই কী ক'রে টাটানগর যাবি?'

—'হেঁটে।'

—'পারবি?'

—'হুঁ।'

—'খুব বাহাদুর তো!' বলে দিদি মুখখানা অন্যদিকে ফেরালো। ভোম্বোলের মনে হলো পদ্মদিদির শাদা কান দুটো রাঙা হয়ে গেছে, দিদি খিল্ খিল্ ক'রে হাসছে। কিন্তু তা'র দিকে আবার মুখ ফেরাতেই দেখলো, তাতে হাসির কোন চিহ্ন নেই, সহজ মানুষ।

বিকেলে ভোম্বোল বললে,—'আমি আজই চলে যাবো।'

—'এই রাতে? পরশু পুজো। পুজোর ক'টা দিন থেকে যা---

—'তবে কাল সকালেই যাস্।'

পদ্মদিদির বর বাড়ি ছিলেন না; সন্ধ্যায় ফিরলেন। ভোম্বোল সেই বিয়ের সময় তাঁকে দেখেছে। তখন ছিলেন রোগা, এখন মোটা-সোটা পালোয়ান গোছের চেহারা হয়েছে।

ভোম্বোলের পরিচয় পেয়ে ও পথচলার বৃত্তান্ত শুনে বললেন,—'বটে! বাড়িতে সুবিধে হ'লো না, টাটানগরের পথে বেরিয়ে পড়েছো?'

—'হুঁ।'

—'আচ্ছা, তা'র আর ভাবনা কী? আমিও কাল কোলকাতার পথ ধরবো। তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দেবো।' লোকটির চোখ দুটো যেন হাসছে। চাউনিটা ভোম্বোলের ভাল লাগলো না; কথাগুলোও কাঠ কাঠ।

রাতে তিনি ভোম্বোলকে পাশে নিয়ে খেতে বসলেন। খেতে খেতে বললেন,—'মাছখানা খেয়ে ফেল। টাটানগরের খাটুনি বড় কঠিন; গায়ে জোরের দরকার।'

পদ্মদিদিও ঘোমটার ভেতর থেকে একটু চাপা গলায় বললে,—'এই খা!'

শাশুড়ী তখন বারান্দায় বসে মালা জপছেন।

ভোম্বোলের লজ্জা করতে লাগলো। সে কিছু কমই খেলো।

রাতে তা'র শোবার জায়গা হলো, পদ্মদিদির শাশুড়ীর ঘরে। তা'র বিছানা হলো একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকের ওপর। সিন্দুকটা সেকালের---একখানা চৌকি বললেই চলে। কিন্তু শুয়ে কিছুতেই তা'র চোখে ঘুম এলো না। কেবলই পদ্মদিদির বরের চোখ দুটো ও কথাবার্তা মনে পড়তে লাগলো। ভোরের দিকে মনে এলোমেলো ছবির সঙ্গে একটু ঘুম এলো বটে, কিন্তু বুড়ীর কাশির শব্দে ঘুম ছুটে গেল।

শুনতে পেল বাইরে কোথায় কাক ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে খুব সন্তর্পণে দরজার খিল খুললো। তখন খুট্ ক'রে শব্দ হলো। বুড়ীর ঘুম ভারী পাতলা। বুড়ী অমনি জিগ্যেস করলে,—'কে?'

—'আমি।'

—'বাইরে যাবে?'

—'হুঁ' বলে ভোম্বোল উঠোনে নামলো। তখনও আবছা অন্ধকার আছে। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে উঠলো।

পনেরো

কান্তিনগরে

বেশ বেলা উঠেছে। ভোম্বোল জোরে হাঁটছে। এক একবার পিছন ফিরে দেখছে, পদ্মদিদির বর ধাওয়া করেছেন কিনা।—না, কেউ নেই।

কিছুদূর গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখলো। ঐ যে দূরে একখানা বাইসিক্‌ল্ আসছে না? পদ্মদিদির বরেরও তো বাইসিক্‌ল্ দেখেছে। তিনি আসছেন কী?

ভোম্বোলের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। কিন্তু লুকোবে কোথায়? দু'ধারে ক্ষেত। তার ধানগুলো কাটা হয়ে গেছে। পাটও নেই। কেবল ক্ষেতের ওপর ধান ও পাটের কাটা গোড়াগুলো একটু একটু বেরিয়ে আছে। খান কয়েক আখক্ষেত দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ক্ষেতগুলো তার কাছ থেকে এত দূরে যে, সেখানে পেঁাছতে না-পেঁাছতেই বাইসিক্‌ল্ এসে পড়বে।

পথের ধারে একটা খেজুর গাছ রয়েছে। তার গোড়ায় চারধারে ভাঁট, কালকাশুন্দি, চারা শেওড়া ও কচুর ঘন ঝোপ। ভোম্বোল তাড়াতাড়ি ঝোপে ঢুকে পড়লো। ঝোপটা তা'র গায়ের ধাক্কায় দুলছে। ভোম্বোল দু'চারটে গাছকে দু'হাতে চেপে ধরে থামিয়ে দিলেও তারা অবাধ্যের মতো মাথা নাড়তে লাগলো।

তারপর, বোধহয়, মাত্র মিনিট তিনেক কাটলো। কিন্তু ভোম্বোলের মনে হলো সময়টা অনেকক্ষণ। তবুও বাইসিক্‌ল্ আসে না। এদিকে গা বেয়ে কাঠ-পিঁপড়ে উঠছে, কাঁধে একটা শুঁয়োপোকা পড়লো, একটা বুনো মাকড়শা তা'র সামনে তাড়াতাড়ি জাল বোনা শুরু করে দিলে। পিঠে মশা কামড়াচ্ছে, পায়ের নিচে কেঁচো শুড়শুড়ি দিচ্ছে। আর তো বসা যায় না।

হঠাৎ খটাং সোঁ সোঁ শব্দ কানে এলো। তারপরই একখানা বাইসিকল্ সাঁ করে চলে গেল। যে চালাচ্ছিল ভোম্বোল তাকে দেখতে পেল না, চিনতেও পারলো না। তবু সে কষ্ট স'য়ে ঝোপে লুকিয়ে রইলো। মিনিট কতক কেটে গেলে বেরিয়ে এলো। সাইকিল্ যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করলো, লোকটা কে? পথটা গেছে বাঁ দিকে বেঁকে। দুধারে বড় বড় গাছ। মোটা মোটা গুঁড়ির আড়ালে চলন্ত গাড়ির ওপর মানুষটিকে চেনা সহজ নয়। পদ্মদিদির বর কী?

ভোম্বোল আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো।

সামনে গাঁ। গাঁয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই বেলা গেল। এই গাঁয়ের নামই বোধহয় কান্তিনগর। মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে। এ গাঁয়েও পুজো হয়? বাড়ির জন্যে তার মন কেমন করে উঠলো। সে যদি এ সময়ে বাড়িতে থাকতো! তার ওপর সারাদিন পথ চলছে; ক্ষিদের আগুনে পেট জ্বালা করছে। তবু সয়ে গেল। না—না, আর বাড়ি নয়। যত দূরেই হোক, একেবারে সেই টাটানগর।

গাঁয়ে ঢুকে দেখে, ছেলে-মেয়েরা নানা রঙের নতুন পোশাক পরে বোধহয় ঠাকুর দেখতে চলেছে। ঐদিকে বোধহয় পুজো-মণ্ডপ। ভোম্বোল তাদের পিছন পিছন চললো।

ছেলে-মেয়েগুলোর সাজের কী বাহার! এদিকে গায়ের রং ঘোর কালো, মাথার তেল কপাল ও রগ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। তা'র ওপরই সিঁথে কাটা! দু'-একজনের চুল আবার সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। ছেলেগুলোর গায়ে লাল, হলদে, বেগুনী রঙের সাটিনের কোট বা ছিটের কামিজ। কোট আর কামিজের হাতাগুলো বড়, ধুতির কোঁচা পেটের ওপর পোঁটলার মতো ঠেলে উঠেছে। সকলেরই পায়ে বাদামী রংয়ের গোড়-তোলা ফিতেবাঁধা জুতো। কারুর জুতো পায়ের চেয়ে বড়। খুলে যাবার ভয়ে সে পা ঘষটাতে ঘষটাতে চলেছে। কারুর জুতো ছোট। সে গোড়ালিতে কাগজ গুঁজে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে হাসছে; সঙ্গীদের দেখাচ্ছে, জুতো জোড়া ঠিকই হয়েছে—পায়ে লাগছে না। কেউ আবার উল্টো করে জুতো পরেছে।

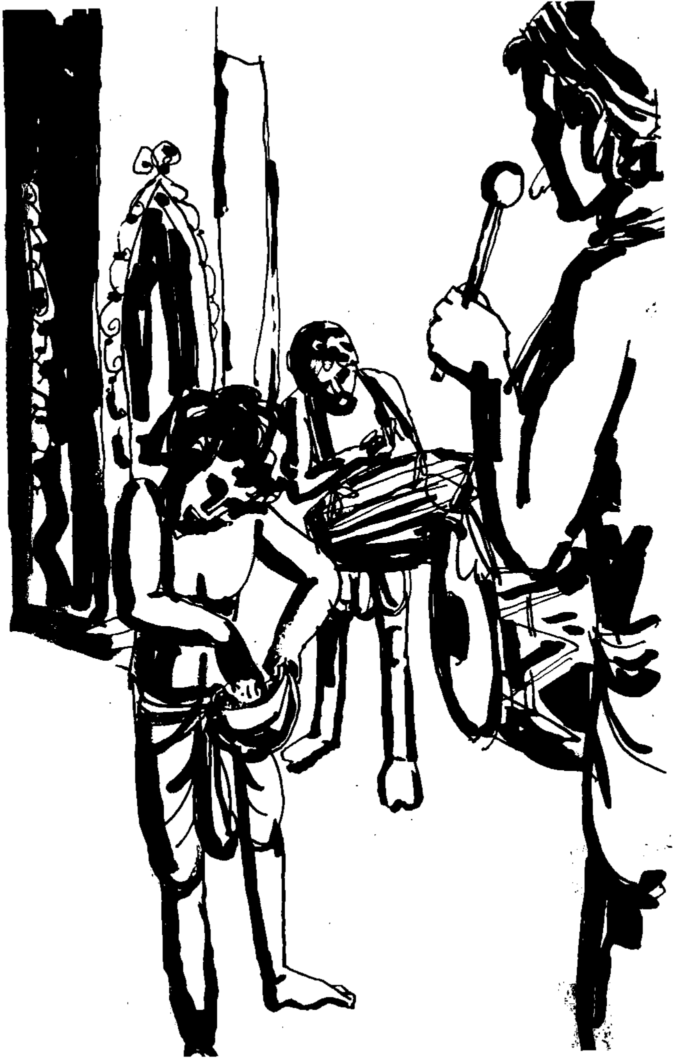

মেয়েগুলোর নাকে নোলক, **কানে মাকড়ি, গায়ে লাল, নীল,** হলদে ঘাগরা ; খালি পা। তারা তেল-জব্‌জবে চুলগুলোয় অ্যালবার্ট কেটে, কেউ বেণী ঝুলিয়েছে, কেউ খোঁপা বেঁধেছে। কোন কোন মেয়ের পরণে রাঙা ডুরে—চারধারে ঘাগরার মতো ফুলে আছে। সকলের মুখে হাসি। ভোম্বোলেরও নতুন জামা-কাপড় পরতে ইচ্ছে হলো। বাড়ি থাকলে সেও আজ সাজ-গোছ্ ক'রে ঠাকুর দেখতে যেতো।

সামনেই একখানা আম-কাঁঠালের বাগান। গাছগুলোর গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে একটা মস্ত চণ্ডীমণ্ডপ যেন দেখা যাচ্ছে। তা'র সামনে লোকজন চলা-ফেরা করছে। বাগানের বাইরে দিয়ে পথ। তবুও বাগানের ভেতর দিয়ে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে চললো চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। ভোম্বোল চললো পথ দিয়ে। যেতে যেতে দেখলো, একখানা বাড়ির বাইরের দিকে একটি তিন-চার বছরের পেট মোটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বগলে একখানা ডুরে। মেয়েটা কী যেন হাতের মুঠো থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাতাসা। ঐ যে কব্জি থেকে কনুই অবধি রস গড়াচ্ছে। মেয়েটার সামনে হাত দুই তফাতে একটা শাদা-কালো রঙের কুকুর তার মুখের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে জিভ্ বা'র ক'রে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মুখ চাটছে আর লেজ নাড়ছে।

ভোম্বোল কুকুরটাকে তাড়া দিলে। তা'তে কুকুরটা লেজ নামালো মাত্র। কিন্তু মেয়েটা বাড়ির ভেতর দিলে ছুট্। ছুটতে ছুটতে তা'র বগলের ডুরেখানার একটা আঁচল খুলে গিয়ে ধুলোয় লুটোতে লাগলো। ভোম্বোলের ভারি মজা বোধ হলো।

ভোম্বোল চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে দেখলো, অনেক লোক জড় হয়েছে। প্রতিমা সিংহাসনে উঠেছে। সে মনে মনে ঠিক করলো রাতখানা সেখানে কাটাবে। কিন্তু এখন যা ক্ষিধে! সে চাকীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় কর্মকর্তার ভুলে আর তা'র বরাতগুণে এক কোঁচড় মুড়ি-নারকোল জুটে গেল। সেই সঙ্গে পেয়ে গেল খান আষ্টেক বাতাসা। কর্তা বোধহয় ভাবলেন, ভোম্বোল বুঝি বাজনদারদের লোক—কাঁসি বাজায়। তা'দের মুড়ি-নারকোল দিতে দিতে ভোম্বোলকেও বললেন,—'কোঁচড় পাত্, ছোঁড়া।'

ভোম্বোলও কোঁচড় পাততেই তিনি তাতে মুড়মুড় ক'রে মুড়ি-নারকোল ঢেলে দিলেন।

মুড়িগুলো আউশের, বেশ টাট্‌কা। দেখতে বেঁটে বেঁটে, গায়ে লাল ছিলে, খেতে মিষ্টি ও মুচমুচে। ভোম্বোল চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দাঁড়িয়ে মুড়ি-নারকোল চিবুতে লাগলো।

ষোলো

চরমাদারিপুরের বারোয়ারি তলায়

সে গাঁয়েই তার রাতখানা কেটে গেল।

শরতের সকাল। সোনালি রোদে চণ্ডীমণ্ডপের সারা আঙিনা মাখিয়ে গেছে। তা'র এককোণে শিশির ভেজা শিউলীতলার পাশে চেনা সুরে সানাই বাজছিল—'গা তোল, গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল—'

ছেলেরা নতুন পোশাক প'রে বাজনদারদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভোম্বোলও তা'দের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জায়গাটি ছেড়ে তা'র কোথাও যেতে মন চাইছে না।

সে মনে মনে ঠিক করলো, পুজো শেষ হ'য়ে গেলে আবার টাটা-নগরের পথ ধ'রবে। এই তো রাস্তা। এ ক'টা দিন এখানেই কাটাবে।

দুপুরে সে একমুঠো ভাত খেতে পেলো। আঁচিয়ে কাপড়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে এসে দেখে, ওধারে পদ্মদিদির বর দাঁড়িয়ে। তাঁর পিছনে তক্‌মা আঁটা এক পিয়াদা। তিনি কর্মকর্তার সঙ্গে কী বিষয়ে যেন কথা কইছেন। ভোম্বোলের মনে হলো তা'রই কথা। সে চট্ ক'রে চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে সরে গেল।

তারপর এক গৃহস্থবাড়ির কলাবাগানের বেড়া ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে প'ড়ে—এক ছুটে বাগান পার হ'য়ে গেল। সামনে গোয়াল। তারপর একখানা খড়ের চালা। তা'র পিছনে ধানের গোলা। ভোম্বোল এসবও পার হলো। ঐ যে রাস্তা, রাস্তায় উঠে সে দিলে ছুট্।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলো, কেউ আসছে কিনা। যা'রা আসছিল, তা'রা সব অচেনা। ভোম্বোলকে ছুটতে দেখে অবাক!

এদিককার পথটা ভাল নয়—কাঁচা-পাকা। গরুরগাড়ি চলাচলে দু'পাশে খাল, মাঝে উঁচু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জুলি—এক্ষেতে ওক্ষেতে জল যাবার জন্যে চাষীরা বোধহয় কেটেছে। এখন সব শুক্‌নো। কেবল রাস্তার নিচে দু'পাশে মাটিকাটা খালে জল। তাতে কলমী-হিঞ্চের বন, দু-চারটি শালুকও আছে। কূলবরাবর শাতি-শুষনি ও থানকুনী বিছিয়ে আছে। এখানে-ওখানে বক ব'সে। জলে পানকৌড়ি ডুব-সাঁতার কাটছে। খালের পাড়ে একটা বেলগাছের মাথায় একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসে বস্‌লো। ভোম্বোল হাতজোড় ক'রে পাখিটাকে নমস্কার করতে করতে মনে মনে বললে,—'যেন ধরা না পড়ি।' পাখিটা কিন্তু হঠাৎ ক্যারর্‌ ক'রে ডেকে উঠেই উড়ে গেল।

তা'তে ভোম্বোলের ভয় হলো। সে পিছন ফিরে দেখলো, পদ্মদিদির বর আসছেন কিনা। তা'কেই ধরবার জন্যে তিনি বোধহয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর ভোম্বোলকে ধরেছেন! তা'র খোঁজ পাবেন সেই টাটানগরের লোহার কারখানায়।

এর পরই তো রেললাইন। কিন্তু সামনে একখানা গাঁ দেখা যাচ্ছে না? হাওড় কোথায়? চারধারে তাকিয়ে দেখলো। হাওড় তো দূরের কথা একটা পুকুরও দেখা যাচ্ছে না। কেবল ক্ষেতগুলো ছড়িয়ে আছে। ওগুলোর শেষে ঐ গাঁ। বোধহয় ঐ গাঁয়েরই ওধারে হাওড়; তারপর রেললাইন।

এদিকে বেলা পড়ে এলো। পশ্চিম দিকটায় আকাশকোলে সোনা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একপাল গরু লেজ নাড়তে নাড়তে গাঁয়ের দিকে চলেছে। পালের পিছনে চলেছে কয়েকটা রাখাল। পাখিরা বাসার দিকে উড়ে চলেছে। একটু পরেই নামবে সন্ধ্যা। পথে দু'চারজনের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু ভোম্বোল তাদের কারুকে আর রেল-লাইন বা সামনের গাঁয়ের নাম জিগ্যেস করলে না।

সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। তবু সন্ধ্যার আগে গাঁয়ে পোঁছতে পারলো না। পথেই সাঁঝের তারাটি ফুটলো, চাঁদ উঠলো। সপ্তমীর চাঁদ; অল্প জ্যোৎস্না—খালের বুকে পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছে। পথের ওপর গাছের লম্বা ও হেঁড়া ছেঁড়া ছায়া। সামনে গাঁয়ের আলো দেখা যাচ্ছে।

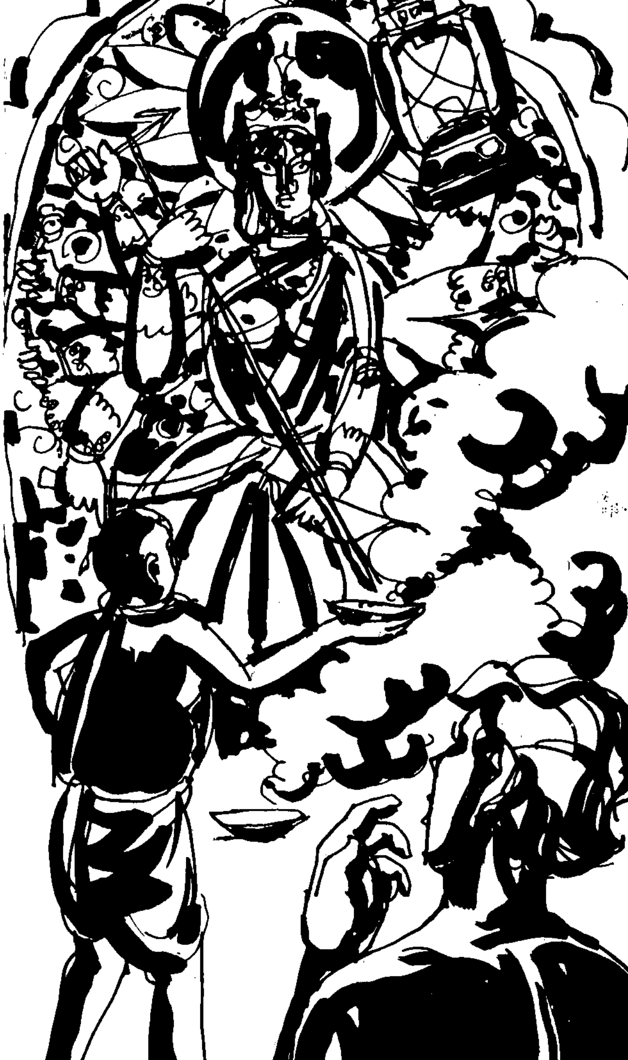

যেন ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। না? তাই তো! এ গাঁয়েও তবে পুজো হয়?

ভোম্বোল এবার ছুটলো। নিশ্চয় আরতি হচ্ছে। আওয়াজটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাক বাজছে। হাঁ, ঐ তো বাজছে,—'লাক চড়াচচড়, লাক চড়াচচড় গিদা গিদা—'

আর বেশি দূর নয়—পথ ফুরিয়ে এলো। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকলো।

বাঁ দিক থেকে ঢাকের আসছে—আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি বউ, গোটা কয়েক ছেলে-মেয়ে কলরব করতে করতে ঐদিকেই যাচ্ছে। ভোম্বোল তাদের পিছন পিছন চললো।

সে ঠিকই চলেছে। ঐ তো মণ্ডপ। আলোয় আলো—গ্যাসের আলো জ্বলছে; জ্বলছে ঝুলন্ত আলো। বাঃ! মস্ত প্রতিমা। আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। পুরুত দু'হাতে দুটো বড় বড় ধুনুচি নিয়ে আরতি করছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব ধোঁয়া—প্রতিমা ঢাকা পড়েছে। ভোম্বোল ছুটতে ছুটতে ভীড় ঠেলে প্রতিমার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ইচ্ছে ছিল আরও কাছে যায়। কিন্তু সামনেটা মোটা বাঁশ দিয়ে আটকানো। ঐ যে ঐদিকটা ফাঁক। সেখান থেকে সরে এসে চত্বর ঘুরে, সে যেই সেদিকে যেতে যাবে অমনি সামনে থেকে কে যেন খপ্ ক'রে তা'র হাত দুটো চেপে ধরলো; ধ'রেই বললে,—'ভোম্‌লা—ভোম্বোল!'

ভোম্বোল চম্‌কে উঠে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—তা'র কাকা!

তা'র কাকা এবার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। আর তা'র পালাবার উপায় নেই। সে টাটানগর যেতে যেতে চরমাদারিপুরের কাছারি-বাড়িতে এসে পড়েছে!

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল—নায়েবমশাইয়ের ভাই-পোকে পাওয়া গেছে।

পিয়াদারা ঢাকীদের বললে,—'জোরে বাজা, পাবি খাজা, হ'বে মজা—'

ঢাকীরা অমনি মহানন্দে তাঁদের দু'জনের চারধারে ঘু'রে ঘু'রে, দুলে দুলে বাজাতে শুরু ক'রে দিলে—,'ঢাট্টা ঢানা ঢট্টে ঢাক্---ঢাট্টা ঢানা ঢট্টে ঢাক্---'

ভোম্বোলের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সে শুনতে লাগলো, ঢাকগুলো যেন বলছে,—'টাট্টা নগর ফস্কে গেল---টাট্টা নগর ফস্কে গেল—; আর, কাঁসিটা তাদের পিছন পিছন খ্যানখেনে গলায় বলছে,---'টম্বোল দাদা, টম্বোল দাদা, টম্বোল, টম্বোল দাদা—'

তারপর ?